PRACHIN O ADI-MADHYA JUGER BANGLA SAHITYA (DASOM THEKE PANCHADASH SATABDI)

MA [Bengali]

BNGL - 702C

First Semester

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Munmun Gangapadhyay
Associate Professor of Rabindra Bharati University

Author
Supriya Kumar Das
Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই-ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই ম্যাপিং
প্রথম একক ঃ চর্যাপদ (পদসংখ্যা ঃ ১,৫,৬,৮,২৮,৩৩,৪০,৪১,৪২,৪৯) আবিষ্কারের ইতিহাস, পুঁথি পারীয়, নামকরণ, সাধন তত্ত্ব, সমাজচিত্র, কাব্য মূল্য বা সাহিত্য মূল্য, পদ আলোচনা	একক - ১ (পৃষ্ঠা ১-২৮)
দ্বিতীয় একক ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশীখন্ড ও রাধাবিরহ) ঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার, রচনাকাল ও নামকরণ, কাহিনীবয়ন ও কাব্য পরিচিতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাদি আলোচনা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরাণ ও 'গীতগোবিন্দম্' এর প্রভাব, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সমাজ সচেতনতা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে 'বংশীখন্ড', চরিত্র বিশ্লেষণ, রাধা বিরহ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ কি প্রক্ষিপ্ত?, রাধাবিরহের গীতিমূর্চ্ছনা, চরিত্র বিশ্লেষণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলীর রাধা	একক - ২ (পৃষ্ঠা ২৯-৫৮)
তৃতীয় একক ঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : মালাধর বসু ভাগবতের সাধারণ পরিচয়, শ্রীকৃষ্ণ বিজয় : মালাধর বসু , কাব্যরচনা কাল শ্রীকৃষ্ণবিজয় : নামকরণ , শ্রীকৃষ্ণবিজয় : কাহিনী শ্রীকৃষ্ণবিজয় : শ্রেণীবিচার , কবিকৃতিত্ব ভাগবতের জনপ্রিয়তার অভাব	একক - ৩ (পৃষ্ঠা ৫৯-৮২)
চতুর্থ একক ঃ কবি বিজয়গুপ্ত : পদ্মাপুরাণ পরিচিতি : পদ্মাপুরাণের কবি বিজয় গুপ্ত, বিজয়গুপ্তের চরিত্রচিত্রণ, আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরণে সমাজভাবনা, পদ্মাপুরণের ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারাদি, কাব্যের রস-নিষ্পত্তি, কবি নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের তুলনামূলক আলোচনা	একক - ৪ (পৃষ্ঠা ৮৩-১২৪)
মনসামঙ্গল : কেতকাদাস ক্ষেমনন্দ ভূমিকা, কবিপরিচয়, কাব্য রচনাকাল, মনসামঙ্গল ও সর্প সংস্কৃতি মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির আর্থসামাজিক ও সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট মধ্যযুগের সমাজ - সংস্কৃতির প্রতিফলন মনসামঙ্গল কাব্যে মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ চরিত্র (শিব, চন্ডী, মনসা, নেতা, চাঁদ সদাগর, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর)	

সূচীপত্র

টিপ্পনী

প্রথম একক ঃ চর্যাপদ (পদসংখ্যা ঃ ১,৫,৬,৮,২৮,৩৩,৪০,৪১,৪২, ৪৯) **(পৃষ্ঠা ১-২৮)**

১.১.১ ভূমিকা

১.১.২ লক্ষ্য / উদ্দেশ্য

১.১.৩ আবিষ্কারের ইতিহাস

১.১.৪ পুঁথি পারীয়

১.১.৫ নামকরণ

১.১.৬ সাধন তত্ত্ব

১.১.৭ সমাজচিত্র

১.১.৮ কাব্য মূল্য বা সাহিত্য মূল্য

১.১.৯ পদ আলোচনা

দ্বিতীয় একক ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশীখন্ড ও রাধাবিরহ) ঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত **(পৃষ্ঠা ২৯-৫৮)**

২.১.১. ভূমিকা

২.১.২. উদ্দেশ্য

২.১.৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার, রচনাকাল ও নামকরণ

২.১.৩. ক) পুঁথি আবিষ্কার

২.১.৩. খ) রচনাকাল ও নামকরণ

২.১.৪. কাহিনীবয়ন ও কাব্য পরিচিতি

২.১.৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাদি আলোচনা

২.১.৫. ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতত্ত্ব

টিপ্পনী

২.১.৫. খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছন্দ

২.১.৫. গ) অলঙ্কার ব্যবহার

২.১.৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরাণ ও ‘গীতগোবিন্দম্’ এর প্রভাব

২.১.৬. ক) পুরাণের প্রভাব

২.১.৬. খ) গীতগোবিন্দের প্রভাব

২.১.৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সমাজ সচেতনতা

২.১.৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ‘বংশীখন্ড’

২.১.৮. ক) বংশীখন্ডে নাটকীয়তা ও গীতিধর্মিতা

২.১.৯. চরিত্র বিশ্লেষণ

২.১.১০. রাধা বিরহ

২.১.১১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ কি প্রক্ষিপ্ত?

২.১.১২. রাধাবিরহের গীতিমূর্চ্ছনা।

২.১.১৩. চরিত্র বিশ্লেষণ

২.১.১৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলীর রাধা

তৃতীয় একক ঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : মালাধর বসু

(পৃষ্ঠা ৫৯-৮২)

৩.১.১ ভাগবতের সাধারণ পরিচয়
৩.১.২ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় : মালাধর বসু
৩.১.৩ কাব্যরচনা কাল
৩.১.৪ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : নামকরণ
৩.১.৫ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : কাহিনী
৩.১.৬ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : শ্রেণীবিচার
৩.১.৭ কবিকৃতিত্ব
৩.১.৮ ভাগবতের জনপ্রিয়তার অভাব
৩.১.৯ সহায়ক গ্রন্থাবলী

চতুর্থ একক ঃ কবি বিজয়গুপ্ত : পদ্মাপুরাণ (পৃষ্ঠা ৮১-৯৮)

৪.১.১ ভূমিকা

৪.১.২ উদ্দেশ্য

৪.১.৩ পরিচিতি : পদ্মাপুরাণের কবি বিজয় গুপ্ত।

৪.১.৪ বিজয়গুপ্তের চরিত্রচিত্রণ

৪.১.৫ আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

৪.১.৬ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরণে সমাজভাবনা

৪.১.৭ পদ্মাপুরণের ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারাদি।

৪.১.৮ কাব্যের রস-নিষ্পত্তি।

৪.১.৯ কবি নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের তুলনামূলক আলোচনা

৪.১.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪.১.১১ সহায়ক প্রশ্ন

টিপ্পনী

মনসামঙ্গল : কেতকাদাস ক্ষেমনন্দ

৪.২.১ ভূমিকা

৪.২.২ কবি পরিচয়

৪.২.৩ কাব্য রচনাকাল

৪.২.৪ মনসামঙ্গল ও সর্প সংস্কৃতি

৪.২.৫ মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির আর্থসামাজিক ও সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

৪.২.৬ মধ্যযুগের সমাজ - সংস্কৃতির প্রতিফলন মনসামঙ্গল কাব্যে

৪.২.৭ মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

৪.২.৮ চরিত্র (শিব, চন্ডী, মনসা, নেতা, চাঁদ সদাগর, সনকা, বেহুলা, লখিন্দর)

৪.২.৯ সহায়ক গ্রন্থাবলী

মুখবন্ধ / ভূমিকা

টিপ্পনী

প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য (পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত), বইটিতে থেকে যে সব তথ্য জানা যাবে সেগুলি হল

ক) চর্যাপদ

খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশীখন্ড ও রাধাবিরহ) ঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত

গ) কৃত্তিবাসী রামায়ণ (অযোধ্যাকান্ড ও সুন্দরাকান্ড) ঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পা দিত

ঘ) পদ্মাপুরাণ ঃ বিজয়গুপ্ত : জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত

ঙ) চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি (নির্বাচিত পদ) ঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'

প্রথম একক

চর্যাপদ (পদসংখ্যা ঃ ১,৫,৬,৮,২৮,৩৩,৪০,৪১,৪২,৪৯)

টিপ্পনী

১.১.১ ভূমিকা

১.১.২ লক্ষ্য / উদ্দেশ্য

১.১.৩ আবিষ্কারের ইতিহাস

১.১.৪ পথি পারীয়

১.১.৫ নামকরণ

১.১.৬ সাধন তত্ত্ব

১.১.৭ সমাজচিত্র

১.১.৮ কাব্য মূল্য বা সাহিত্য মূল্য

১.১.৯ পদ আলোচনা

১.১.১ ভূমিকা ঃ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ আবিষ্কার এক এবং দিগন্তের সূচনা করল। এতদিন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন আমাদের সামনে ছিল না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ খীষ্টাব্দে নেপালের রাজ গ্রন্থাগার থেকে এই অমূল্য সম্পদটি আবিষ্কার করলেন। চর্যার পূর্বে বাংলা ভাষার আর কোন নিদর্শন দেখা যায় না তাই এর ঐতিহাসিক ও সাহিত্য মূল্য অপরিসীম। চর্যাগীতিতে ধর্মকে আশ্রয় করে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ পদগুলি সূচনা করেছেন। তাদের সাধন প্রনালী ও জীবনের গূঢ় তত্ত্বকথাকে আলো আঁধারী ভাষায় সংগীতায়িত।

চর্যাগীতি পদাবলীর নামকরণ নিয়ে যেমন মতানৈক্য বর্তমান তেমনি ভাষা, রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকাল নিয়েও পন্ডিতমহলে মতাবিরোধ বর্তমান। ৫০টি চর্যায় ২৪জন আচার্যের নাম আছে। যাদের আবির্ভাব কাল সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী মতে ১০ম-১২শ শতাব্দী। ড: শহীদুল্লাহ ভুশুকু ও কাহ্নপদকে ৮ম শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করে চর্যার আনুমানিক রচনাকাল ৮ম-২২শ শতাব্দী ধরেছেন।

১.১.২ উদ্দেশ্য ঃ

১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার ও ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরাণবাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃক প্রকাশের

টিপ্পনী

সাথে সাথে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উপাদান আমাদের সামনে উপস্থিত হল। না না অজানা অনুল্লেখিত দিক আমাদের সামনে প্রশ্ন চিহ্ন ডানা মেলল। বৌদ্ধ সহাজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ সাধন তত্ত্বের রূপকে গভীর জীবনবোধ ও বোধিচিত্ত সম্পর্কে নানা অনুসঙ্গ সংগীত গুলিতে চিত্রিত। প্রাচীন বাংলার এই নিদর্শন থেকে তৎকালীন বাংলাদেশ ও সন্নিহিত ভৌগলিক পরিবেশ তার সমাজ রাষ্ট্রীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে একটা চিত্র দেখতে পাই। বৌদ্ধ সহজিয়া কাব্যগণের পরিচয়, গুঢ় সাধন প্রনালী ও প্রাচীন বাংলা ভাষার পরিচয় লাভ করতে পারি এই চর্যাপদ নামক প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শনটি থেকে চর্যারগীতি ধর্মিতা যেমন পরবর্তী ধারায় প্রবাহিত তেমনি চর্যার সমাজচিত্র ও সাহিত্যিক মূল্যও আমাদের কাছে লভ্য।

১.১.৩ আবিষ্কারের ইতিহাস ঃ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম নিদর্শন হল চর্যাচর্য বিনিশ্চয়। এই বৌদ্ধ সাধন সংগীত মলিকা গ্রন্থের পঁথি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতার পথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কালের একমাত্র নিদর্শন ও পরিচয় বহনকারী চর্যার আবিষ্কার ও প্রকাশের ইতিহাস আমাদের আলোচনা আবশ্যক।

১.১.৩. ক) পুঁথি আবিষ্কার ঃ

সর্বপ্রথম বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের বিষয়, দর্শন নিয়ে পাঠক কৌতুহলী দৃষ্টি খুলে দেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়। তিনি নেপাল থেকে বৌদ্ধতান্ত্রিক বিভিন্ন বিষয় দর্শন ধরনের বহু পুঁথি সংগ্রহ করেন। পুথি গুলির বিবরণ দিয়ে ১৮৮২ খীষ্টাব্দে 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' নামে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর সমরনীর পথি অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। পূর্ববর্তী সংগ্রহকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে নেপালের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বহু পুঁথি রক্ষিত আছে, এই সিদ্ধান্তের উপর ভয় করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি যে সব পুঁথি গুলি সংগ্রহ করেন সবগুলি সংস্থিতে রচিত। ১৯০৭ সালে নিজে তৃতীয় বার নেপালে গিয়ে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' (চর্যাগীতিকোষ), সরহপাদের অবহট্ঠে রচিত দোহা, অদ্বয় বজ্রের সংস্কৃতে রচিত 'সহজান্নায় পঞ্জিকা' নামে টীকা, কৃষ্ণাচার্যের দোহা এবং আচার্যপাদের 'মেঘলা' নামে সংস্কৃত টীকা সংগ্রহ করেন। এর পূর্বে ১৮৯৮ সালে বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ অধ্যাপক বেন্ডেলের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যাত্রা করে 'ডাকার্নব' নামে একটি পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। অবশেষে বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উল্লোখিত হল - ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্মাদনায় চর্যাচর্য বিনিশ্চয়, সরহচার্যের দোহা, কৃতাচার্যের দোহা ও ডাকার্নব নিয়ে 'হাজার বছরের পুরান বৌদ্ধগান ও দোঁহা' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। সংযুক্ত হল একটি পালক চর্যাচর্য বিনিশ্চয়।

চর্যার আবিষ্কার সম্পর্কে সুকুমার সেনের মন্তব্য 'আজ অবধি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সিদ্ধাচার্যদের সাধনতত্ত্ব-জ্ঞাপক ও অধ্যাত্ম-নিদর্শন বিদ্যমান। চর্যাগীতিগুলিতেই উদ্ভুয়মান

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য-নিদর্শন বিদ্যমান। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের আগে চর্যাগীতিকারদের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল। এগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।'

চর্যাগীতি গুলি প্রাচীন বাংলা ভাষায় লেখা হলেও এতে অবহট্‌ঠের ছাপ থাকায় কোন কোন পন্ডিত একে 'প্রাচীন হিন্দী, প্রাচীন মৈথালী, প্রাচীন ওড়িয়া অথবা প্রাচীন অসমীয়া- অর্থাৎ বাঙ্গালা ছাড়া অপর একটি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা - বলিয়া মনে করেন।' ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তার The origin Development of the Bengali Language গ্রন্থে সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করেন চর্যার ভাষা বাংলা।

টিপ্পনী

১.১.৪ পুঁথির পরিচয় ঃ

তাল পাতার লেখা পুঁথি চর্যাচর্য বিনিশ্চয় নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল। চর্যার প্রথম সম্মুখে পৃষ্ঠায় পুঁথির পরিচয় হিসাবে দেবনাগরী অক্ষরে 'চর্য্যাচর্য্যটীকা' নামটি লেখা আছে মূলত মূল পুথি প্রাচীন নেপালী বা নেওয়ারি হরফে লেখা, এর মধ্যে মাঝে মাঝে প্রাচীন বাংলা হরফও আছে। পুথিতে ১ থেকে ৬৯ পর্যন্ত পৃষ্ঠাঙ্ক আছে। পুথির মধ্যে ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ এবং ৬৬ সংখ্যক পত্রগুলি নেই। হস্তগত পুথির কয়েকটি পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেছে। তিনটি পুরা পদ ২৪,২৫ ও ৪৮ এবং একটি পদের (২৩) শেষ অংশ পাওয়া যায়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাড়ে তিনটি পদ বাদ দিয়ে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' য় প্রকাশ করেন। টীকাকার মুনিদত্ত সম্ভবত ৫১টি পদের সংকলন করেছিলন, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী সমগ্র চর্যার তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন। এই অনুবাদের প্রথম সন্ধান দিয়েছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার ODBL গ্রন্থের প্রথম খন্ডে। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরো জানালেন -

'অবশ্য তাঁহার পূর্বে পি. কোর্ডিয়ার সাহেব 'তেঙ্গুর' নামক বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্র বিষয়ক তিব্বতী গ্রন্থ তালিকার যে ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহাতে সর্বপ্রথম এই তিব্বতী অনুবাদের আভাস পাওয়া যায়। ডঃ বাগচী যে তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন, তাহাতে বিনষ্ট সাড়ে তিনটি চর্যার তিব্বতী ভাষান্তর পাওয়া গিয়াছে।'

চর্যাপদাবলীর পুঁথি গুলি তাল পাতায় লেখা। পুঁথির পাতা গুলির আকার ১২-৮/১০ ইঞ্চি X ১-৯/১০ ইঞ্চি। প্রতিটি পৃষ্ঠায় পাঁচটি করে পঙ্‌ক্তি বর্তমান। প্রথম ও অন্তিম পঙ্‌ক্তি একটানা লেখা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির মাঝামাঝি জায়গা পুঁথি বাঁধার জন্য বর্গাকৃতি ছাড় দেওয়া আছে, চরণ অন্তিমে একটা দাড়ি (।) এবং দুটি দাড়ি (।।) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি পদের বাগ-বাগিনারও উল্লেখ আছে।

১.১.৫ পুথির নাম করণ ঃ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৯১৬ খীষ্টাব্দে চর্যাপদের পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর চর্যাপদের নাম করণ নিয়ে পন্ডিত গবেষক মহলে বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় ওঠে। প্রত্যেক পন্ডিত গবেষক যুক্তি প্রমাণ দিয়ে গ্রন্থের নামকরণকে সমর্থন করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধে জানালেন -

টিপ্পনী

'১৯০৭ সালে নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' ।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় গানগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে গ্রন্থের নামকরণ করেছেন। 'চর্য্যা' শব্দের অর্থ আচরণীয় এবং অচর্য্যা শব্দের অর্থ অনাচরণীয়। বৌদ্ধ সহজযানী কাবকদের কর্ম পঙ্কতির কথা মাথায় রেখে সংকলনের নাম করেছেন – 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়'। বিধুশেখর শাস্ত্রী Indian Historical Quarterly পত্রের ৪র্থ খন্ডে এ বিষয়ে আলোচনা করে জানিয়েছেন নির্মলগিরা টীকার উপর ভ্রান্ত পাঠের উপর ভিত্তি করে 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' করেছেন।

বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম করা উচিত – 'আশ্চর্য চর্যাচয়'। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী Calcutta Oriental Journal (Vol-I) এ Some Aspects of Buddhist Mysticism নামক প্রবন্ধে চর্যাগান গুলি নাম দিয়েছেন – 'চর্যাশ্চর্যাবিনিশ্চয়'। যেহেতু গ্রন্থের কোন পুষ্পিকা পাওয়া যায় নি তাই নামকরণ নিয়ে পন্ডিত ও গবেষক মহলে বিতর্কের অবসান ঘটেনি। বিধু শেখর শাস্ত্রীর 'আশ্চর্যচর্যাচয়' এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' দুটিই পরিকল্পিত। তিব্বতী অনুবাদেও চর্যাগানের কোন নাম পাওয়া যাচ্ছে না। তেঙ্গুর গ্রন্থমালা থেকে অনুমান করা যায় যে চর্যার নাম ছিল – চর্যাগীতি কোষ বৃত্তি। তেঙ্গুরে এ রকম আরও অনেক চর্যাগীতিকার উল্লেখ রয়েছে।

ডঃ নির্মল দাশের এ সম্পর্কে মন্তব্য –

'তিব্বতী অনুবাদ – পুথির সূত্রে পুথির যে নাম জানা যায় সেই 'চর্যাগীতি কোষ বৃত্তি' নামটিই পুথির প্রকৃত নাম হিসাবে নিঃসংশয়ে গ্রহন করা যায়।'

১.১.৬ রচনা কাল ঃ

চর্যার রচনা কাল সঠিক ভাবে নির্ণয় করা দুরুহ বিষয়। গবেষণায় উঠে এসেছে যে হরপ্রসাদ বাবুর পুথি পুরাতন চর্যাগীতির সঠিক সঙ্কলনে অনুলিপি। প্রথম লেখা ও অনুলিপির মধ্যে একটা কালগত পার্থক্য নিশ্চয় আছে। এই চর্যাগীতি গায়কের মুখে মুখেই কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বলে মনে হয়। পুথিতে চর্যার সংগীতে ভাষা যে ভাবে পাওয়া যাচ্ছে তা সর্বতোভাবে প্রথম রচনা কালের সমসাময়িক হবে না। হয় টীকা লেখার সমসাময়িক নয়তো পুথির লিপি কালের সমসাময়িক। প্রকৃত রচনা কাল নির্ণয় করা খুবই জটিল।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কবিদের আবির্ভাবকাল ও ভাষা তাত্বিক দিক দিয়ে চর্যার রচনা কালের নিম্নতম সীমা দ্বাদশ শতাব্দী ধরেছেন। প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও চর্যার রচনা কাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনুমান করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন সুনীতি বাবুর সমর্থনে জানালেন –

'নানা কারনে সুনীতি বাবুর মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।'

ডঃ সুহম্মদ শহীদুল্লাহ লুই পাদকে প্রাচীন সিদ্ধাচার্য মেনে নিয়ে চর্যা সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর রচনা বলে মনে করেছেন। আচার্য রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন সরহপাদকে আদি সিদ্দাবার্য মেনে চর্যার গানগুলির রচনা কাল ৮ম – ১২শ শতাব্দীর বলে মনে করেন। ডঃ নির্মল দাশ মানসোল্লাস ও গানের বিষয়বস্তু, গানের গঠন পদ্ধতি, গায়েনরীতি বিশ্লষণ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন-

'এই অপ্রত্যক্ষ তথ্য থেকে অনুমান করা যায় – গান গুলির রচনা কালের মন্তব্য নিম্নসীমা মোটামুটি দ্বাদশ শতাব্দী।'

১.১.৭ চর্যার ভাষা ঃ

চর্যাগীতি পদাবলীর ভাষা নিয়ে ভারতীয় নব্য ভাষাভাষীদের মধ্যে দড়ি টানাটানির শেষ নেই। সম্পাদক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা ভাষার সিদ্ধান্ত পন্ডিতেরা মেনে নেন নি। ভাষা তাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার চর্যা ও দোহা কোষকে হিন্দী ভাষার রচনা বলে জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন 'words and forms of many dialects' অবাধে প্রবেশ করলেও মূল কাব্য হিন্দী। রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রমুখ পন্ডিতেরা মনে করেন চর্যার ভাষা মূলত প্রাচীন হিন্দী। ডঃ সুকান্ত মিত্রের 'A History of Maithili literature Vol-I' চর্যাকে মৈথালীর আদি নিদর্শন বলে মনে করেন।

টিপ্পনী

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম চর্যাগীতির ভাষা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন – 'we have in this caryas some of the oldest documents in any NIA language, documents of prime importance for NIA Philology (ODBL) - এই কথার মধ্য দিয়ে চর্যার ওপর অন্যান্য ভাষা ভাষীদের দাবীকে নস্যাৎ করেছেন। অন্যদিকে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্বের রূপসি নির্ভুল ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনিই প্রথম চর্যার ভাষাকে প্রাচীন বাংলা ভাষা বলে প্রমাণ করেন। বাংলা ভাষার তখন সদ্য জন্ম হয়েছে তাই মাগধী অপভ্রংশ, অবহট্টের প্রভাব তাই মুছে যায়নি। তখনো বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা পায়নি, তাই তার রূপ বা আদর্শ ঠিক কি ভাবে বিষয়ে পদর্ক তারা নিশ্চিত নন। হিন্দী, মৈথিলি যেমন তেমনি ওড়িয়া, অসমীয়াতে চর্যাকে নিজেদের ভাষার সাহিত্য বলে দাবী করেন।

চর্যার ভাষা যে বাংলা তার সপক্ষে যুক্তি –

শব্দরূপে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট বিভক্তি –

তৃতীয়ায় – তেঁ (তে) বিভক্তি – সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিঅই।

চতুর্থীতে – রে – খো করউ রসরসানেরে কংখা।

সপ্তমীতে – ত, তে – এ – হাড়ীত ভাত নাহি ইত্যাদি।

বাংলা বিশিষ্ট ইডিয়ম ও প্রবচন গুলি হল –

গুনিআঁ লেহুঁ, লেহুরে জানী, কহন ণ জাই অপর্না মাংসে হরিণা বৈরী হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী প্রকৃতি।

চর্যাগীতিতে দেখা যায় যে ছন্দের অনুরোধে বাক্যের বাহ্য পদবিন্যাসের বিপর্যয় ঘটলেও অভ্যন্তরীন বাক্যাংশের নিজস্ব অন্বর অক্ষুন্ন রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ নিলে তা বোঝা যায় –

বাক্যের যে অংশে যৌগিক ক্রিয়াপদ অবস্থিত সেই অংশের অন্বয় অপরিবর্তিত আছে – যেমন – বাই পইঠা, টুটি গেলি, গুনিআ লেহুঁ, অবসরি জাই, ধরণ ণ জাই ইত্যাদি।

কৃদন্ত বিশেষণ + বিশেষ্য – দুহিল দুধু, বেঢ়িল হাক বুড়িলী মতিদ্দী ইত্যাদি।

নঞর্থক বাক্যাংশ – ন পুচ্ছনি, ন জাই, ন ভুলহ, মা জাহী, মা হোহী ইত্যাদি।

সন্ধ্যা ভাষার স্বরূপ ঃ–

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের 'সমভিপ্রায়ী'দের জন্য বিশেষ আভপ্রায়িক ভাষা সাধারণের কাছে দুরুহ বলে মনে হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদাবলীর ভাষাকে বলেছেন –

টিপ্পনী

'সন্ধ্যা ভাষা' বা 'আলো–আঁধারি ভাষা' যা 'কতক বুঝা যায়, কতক বুঝা যায় না। বজ্রযান গ্রন্থে 'সন্ধ্যাভাষা' শব্দটির বহুল ব্যবহার হয়েছে' যাঁর অর্থাৎ বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরাই এর অর্থ অনুধাবন করতে পারেন। ১৯২৪ সালে Visvabharati Quarterly তে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'সন্ধ্যা' ভাষার অর্থ 'সন্ধ্যা' দেশের ভাষা। এর অর্থ আর্যাবর্ত অর্থাৎ পূর্বভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চল। অন্য দিকে ম্যাক্সমূলার 'সন্ধ্যা' শব্দটিকে 'প্রচ্ছন্ন' অর্থে গ্রহণ করার পক্ষপাতী।

চর্যাগীতির মূল বিষয় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষযক। এখানে আছে ধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ের নির্দেষ প্রদান। যা সকলের বোধগম্য নয়, তারা তাদের বক্তব্যকে কতকগুলি ভিন্ন অর্থবহ শব্দ, উপমার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। চর্যাগানের টীকা রচনাকার মুনিদত্ত চর্যায় ব্যবহৃত বিশেষ শব্দগুলির অভ্যন্তরে গূঢ় অর্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ও চর্যার ভাষার সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে 'সন্ধ্যাভাষা' 'সন্ধ্যা' ব্যবহার করেছেন। ডঃ নির্মল দাশের গ্রন্থ থেকে পারিভাষিক শব্দগুলির কয়েকটি উদাহরণ গ্রহণ করা যেতে পারে –

মূল শব্দ (চর্যায়)	লৌকিক অর্থ	গূঢ় অর্থ
হরিণা (৬)	হরিণ	চিত্ত
হরিণী (৬)	হরিণী	জ্ঞানমুদ্রা
ডোম্বী (১০)	ডোমরমণী	পরিশুদ্ধারধূতিকা
গঙ্গা জউনা (১৪)	গঙ্গাযমুনা নদী	চন্দ্রাভাস ও সূর্যাভাস
দুলি (২)	কচ্ছপ	মহাসুখ কমল
শবর (৫০)	শবর জাতীয় পুরুষ	বজ্রধর, হেবুক
শবরী (৫০)	শবর জাতীয় নারী	দেবী নৈরাত্মা

চর্যাগীতি সম্পর্কে সুকুমার সেনের মন্তব্য –

'চর্যাগীতি গুলি তত্ত্ব–সাধনাঘটিত পারিভাষিক শব্দে কণ্ঠকিত ও লৌকিক তৎকাল অপরিচিত উৎপ্রেক্ষায় আকীর্ণ, এবং গান বলিয়া রসহীন নয়। এই চর্যাগান গুলির আসল উদ্দিষ্ট গভীর ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনায় এ গুলির সাধন–সঙ্কেত দ্যোতিত।'

স্ব–অধ্যায় সামগ্রী
6

প্রকৃতপক্ষে চর্যার ভাষা দ্বিস্তর যুক্ত ভাষা, যার উপরের একটি অর্থ এবং ভিতরের আর একটি অর্থ। অনেকে চর্যার ভাষাকে – প্রহেলিকাপুর্ণ ও হেঁয়ালী ভাষা বলে মন্তব্য করেছেন।

শেষে নির্মলদাশের সঙ্গে সহমত হয়ে বলা যেতে পারে –

'যে ভাষার অভীষ্ট অর্থ সম্যক ধ্যান (সম-ধ্যে) যোগে বুঝতে হয়' এরকম ব্যুৎপত্তি করলে 'সন্ধ্যা' বানানটি অক্ষুন্ন থাকে। এই ভাষার অর্থবোধের সঙ্গে যে 'ধ্যানের' সম্পর্ক ছিল টীকাকার মুনিদত্ত ১২ সংখ্যক চর্যার টীকার গোড়াতেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন, 'পুনরপি তমেবার্থং দ্যুতক্রীড়াধ্যানেন প্রকথয়ন্তি কৃষ্ণচার্যপাদাঃ।'

প্রকৃতপক্ষে 'সন্ধ্যা'র বানান ও ব্যুৎপত্তি যাইহোক না কেন, সন্ধ্যাভাষা যে কোন আঞ্চলিক উপভাষা নয়, আসলে গূঢ়ার্থ প্রতিপাদক এক ধরনের বচন – সংকেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

টিপ্পনী

আত্মমূল্যায়ণ ধর্মী প্রশ্ন –

১/ চর্যাগীতির আবিষ্কার ও পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান কর।

২/ চর্যাপদাবলীর প্রকৃত নাম সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩/ চর্যাগীতির ভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

চর্যার ছন্দ ঃ–

চর্যার রচনা কাল গীত গোবিন্দের থেকে ও প্রাচীন। বাংলা ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাসে চর্যার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই চর্যার ছন্দে অপভ্রংশ ও অবহট্টের প্রভাব আছে বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ পাদাকুলক ছন্দের কথা বলেছেন। চর্যার দুটি ছন্দের প্রভাব লক্ষিত হয় – একটি যোলমাদ্রার প্রাচীন 'পদ্ধড়ী' বা 'চৌপদী' ছন্দ এর থেকেই বাংলা পদ্দার ছন্দের উৎপত্তি। আর আছে প্রত্ন মাদ্রাবৃত্তের দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ। পরবর্তী কালে এই দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ বাংলা অক্ষরবৃত্ত ত্রিপদী ছন্দের প্রচলন দুটি গেছে।

পদ্দারের উদাহরণ –

কাআ অরুবর। / পঞ্চবি জল। ৪+৪//৪+৩

চঞ্চল চীত্র। / পইধো কাল। ৪+৪//৪+৩

ত্রিপদী উদাহরণ –

গঙ্গা জউনা মাঝে রে কইই নাঈ।।
তাই বুড়িলী মাতঙ্গী জোই আ
লীলে পার করেই।।

চর্যার ৩৬টি গানই পাদাকুলক ছন্দের আদর্শ রক্ষিত (৪+৪+৪+৪+১৬ মাদ্রা) হয় নি। স্বরাখাতের ফলে মাদ্রাসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্তি ঘটেছে। অনেকেই পাদাকুলকের মধ্যে 'দোহা'র প্রভাব লক্ষ করেছেন। চর্যার ছন্দের ক্ষেত্রে প্রতিপদে চরনীন্ডিক মিল লক্ষ্য করার মত। চর্যা কবিরা

বৌদ্ধ সাধন সংগীত বচনা করতে গিয়ে যথাসম্ভব ছন্দেরও অন্তমিলের দিকটি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।এর যে পদ দেখিয়ে ছিলেন সে পথেই বাংলা ছন্দ যুক্তির পথ যা থেকে আধ্যুনিক বাংলা ছন্দ বিজ্ঞানের জায়গা শুরু। এ এক প্রথম ঐতিহাসিক পদক্ষেপ যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক নির্ণায়ক।

বৌদ্ধদর্শন ও চর্যাপদাবলীর সাধনতত্ত্ব ঃ-

টিপ্পনী

ভগবান গৌতমবুদ্ধের প্রেম মৈত্রী মুক্তি করুণার বাণী বিশেষ অঞ্চলের ধর্ম নয় তা দেনাকালের ব্যবধান ঘুচিয়ে বিশ্যজনীন মানবাত্মার মুক্তির পথ প্রদর্শক। মানব জীবনের প্রয়োজনে বুদ্ধদেবের মর্তলোকে আবির্ভাব। বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী পালি ভাষায় সূত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। অবশ্য তিনি বেঁচে থাকা কালে কোন গ্রন্থ রচনা করে যান নি। বাস্তব জীবনে সমস্যা থেকে উত্তরনের পথ তিনি দেখিয়েছিলেন। অবিদ্যা, জরা-মৃত্যু থেকে জীবলোককে মুক্তির বাণী প্রচার করেছিলেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তার শিষ্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয, যার যাল স্বরূপ - হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব। আনুমানিক খী.পূ. ২০০ অব্দের দিকে মহাযান হীনযানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, ফলে 'নবধর্মের' অভ্যুত্থানে হীনযান অপসারিত হয়।

হীনযান ও মহাযানের মধ্যে হীনযান বাহ্যবস্তুর বস্তুসত্তায় বিশ্বাসী। আত্ম নির্বান লাভ এদের একমাত্র কাম্য। দার্শনিক দিক দিয়ে হীনযানের দুটি উপবিভাগ - (ক) বৈভাষিক (খ) সৌত্রান্দ্রিক। মহাযানে আদর্শ বুদ্ধের মৃত্যু দীর্ঘদিন পরে প্রতিষ্ঠিত। মহাযান পন্থা শুধু আপনার নির্বানলাভের জন্যই আকাঙ্খা নয় সমগ্র বিশ্বের পীড়িত আত্মার কল্যাণের কথাই চিন্তা করে ছিল। মহাযান দুই ভাগে বিভক্ত - (ক) মাধ্যমিক (শূন্যবাদ) (খ) যোগাচার (বিজ্ঞানবাদ)। হীনযান মহাযানে বৌদ্ধ দর্শন স্তব্ধ হয়ে থাকল না। মহাযানে হিন্দু দেবদেবী প্রভাব পড়তে লাগল এবং আচ্ছন্ন করে ফেলল। এর ফলে উদ্ভুদ হল মন্ত্রযান অর্থাৎ কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান।

চর্যাগানের বহিঃরঙ্গে রয়েছে চিত্রকথা আর অন্তরঙ্গে আছে সাধনতত্ত্ব। চর্যাকারদের ধর্মচিন্তা তন্ত্র প্রভাবিত হওয়ায় গান গুলিতে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে সাধন প্রনালী অধিকতর স্থান পেয়েছে। চর্যাগীতিতে যে সাধন প্রনালীর কথা আছে তা বৌদ্ধ সহজযানী সম্প্রদায়ের। তন্ত্রের মূল সাধনা কায়া সাধন।

'চর্যার সাধক্যান শূন্য, করুণা ও মহাসুখ - এই তিনটি সত্তাকে কখনও পৃথক ভাবে, কখনও বা যৌথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রায়ই নানা প্রকার প্রতীকও বাস্তব অভিজ্ঞতার বাতায়নে দাঁড়াইয়া অদ্বয় মহাসুখ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। এই মহা সুখকে চর্যাকার্য্যাণ ডোম্বী, শবরী, হরিণী, নৈরামণি, নৈরাত্মাবধূতিকা প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়াছেন।' (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নয়।

চর্যাগানের প্রধান তত্ত্ব 'মহাসুখ রূপ নির্বানলাভ'। এই মহাসুখ, শূন্যতা ও করুনা তত্ত্বকে সহজিয়া সাধকেরা কায়া সাধনার উপর স্থাপন করেছেন। দেহসাধনার ক্ষেত্রে তারা চারটি চক্র বা পদ্মের কল্পনা করেছেন। যেমন -

১) নাভিতে - নির্মাণচক্র।

২) হৃদয়ে - ধর্মচক্র।

৩) কণ্ঠে – সম্ভোগচক্র।

৪) মস্তকে – সহজচক্র বা মহাসুখ চক্র।

এ ছাড়াও তিনটি নাড়ীকে সাধনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে –

১) বামগা নাড়ী (ইড়া) – প্রজ্ঞারূপিণী।

২) ডানগা নাড়ী (পিঙ্গলা) – উপায়রূপিণী।

৩) মধ্যগা (সুষ্মুনা) – অবধূতী।

টিপ্পনী

সহজভাবে বোঝার জন্য চিত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে –

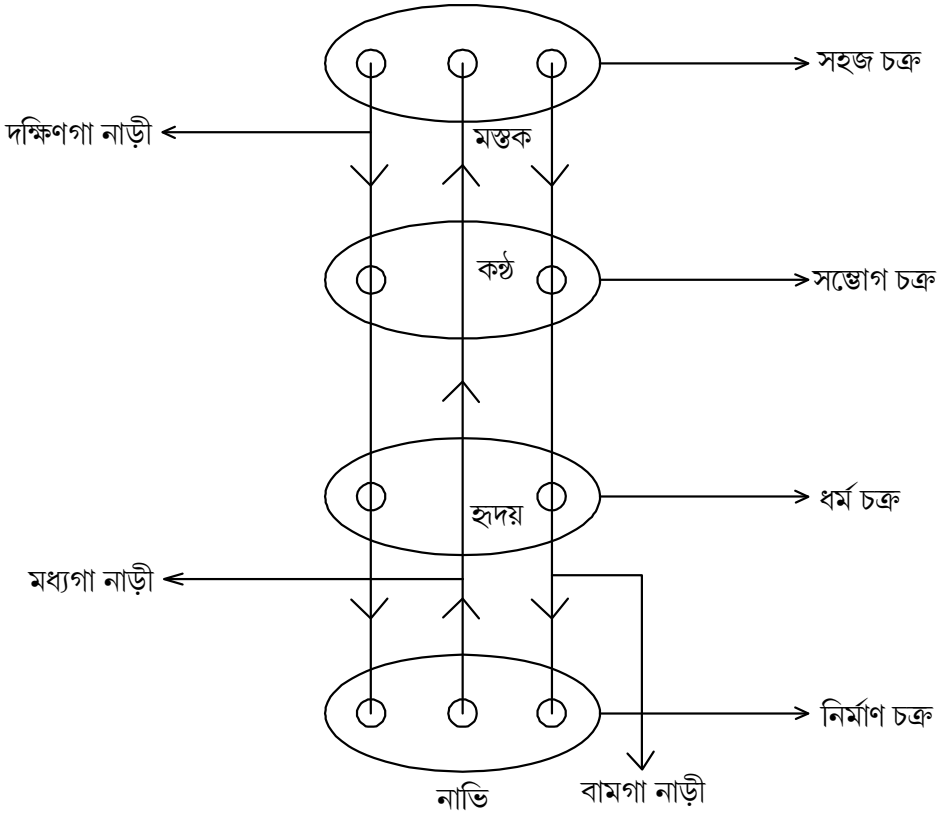

যা আছে ব্রহ্মান্তে তা আছে দেহ ভান্ডে বউলদের এই দেহ সাধনায় যে নতুন মানুষ, অরূপ বতনের সাধনা তা চর্যায় ধ্বনিত।

'নিয়ডহি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।' – এই দেহ পুরেই সব আছে তাকে পাবার জন্য লঙ্কায় যাবার প্রয়োজন নেই।

'ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু অন্তে চিখিল মাঝেঁ ন যাহী।।'

পদটিতে নদীর দুই পড় কর্দমাক্ত, মাঝখানে থৈ পাওয়া যায় না। এর মধ্য দিয়ে ডানগা বামগা দুই ধারা পর দিয়ে সাঁকো অর্থাৎ মধ্যমগা নাড়ী। তার উপর দিয়ে সন্তর্পণে সাধনার পথে এগোতে হবে।

সোনে ভরিলী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ধাবী।।

টিপ্পনী

এই পদটিতে অপূর্ব সাধন প্রণালী প্রকাশিত। করুণা ও শূন্যতার মিলনে রূপ জগতের স্থান নেই। আর নৌকা এখানে গগন অভিসারী অর্থাৎ নির্মাণ চক্র থেকে মহাসুখ চক্রের দিকে যাত্রা করেছে। এভাবেই রূপকাল সন্ধ্যা ভাষার আড়ালে চর্যাগানে বৌদ্ধ সাধনতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

চর্যাপদাবলীতে প্রকাশিত সমাজ জীবন ঃ-

সাহিত্য সমাজজীবন নির্ভর তাই ধর্মীয় সাহিত্য বা কোন ধর্মের সাধন সংগীত হোক না কেন তাতে সমাজ জীবনের প্রভাব পড়তে বাধ্য। আনুমানিক দশম-দ্বাদশ শতকে লেখা চর্যাগীতি পদাবলীতে তত্ত্ব-দর্শন ও সাধনার সঙ্গে আমাদের পরিচিত সমাজের প্রতীক ও রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীন বংলোর এক আলেখ্য চর্যার সাধন সংগীতে স্থান পেয়েছে। ডঃ নির্মল দাশ এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন -

'কাব্যের উদ্দেশ্য সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন না হলেও কাব্য যেহেতু জীবন নির্ভর সেইজন্য কাব্যের মধ্যে জীবনের বাস্তব পটভূমি তথা সমাজ - পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্ধান করলে ইতিহাস বেত্তারা একেবারে বিফল হন না। চর্যাগীতির মূল বিষয় অবশ্য জীবনের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত বা সামাজিক সংস্থানের সঙ্গে অন্বিত নয়, বরং চর্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী তত্ত্বের দিক থেকে জীবন-বিমুখ ছিল বলেই বলা চলে। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশায় ভরা এই যে রক্তমাংসের জীবন চর্যাকারদের কাছে তা 'সুইনে আদর্শ জইসা' - স্বপ্নের ছবি ও দর্পণের প্রতিবিম্বের মতই সত্য বলে মনে হলেও আসলে সত্য নয়।'

চর্যাকারগণ জীবন বিমুখ মনে হলেও তারা বাস্তব থেকে উপাদান গ্রহণ করে বাস্তবকে স্বীকার করেছেন।

সুকুমার সেন বলেছেন - 'চর্যাগীতিতে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাভাষিত চর্যাগীতিগুলিতে, সমসাময়িক তুচ্ছ নীচ সাধারণ জীবনের যে সত্য ছবি তাহার তুলনা কোথা ও নাই।' বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের লেখক অসত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মত পোষন করে বলেন -

'এই পদ গুলিতে সমাজ ও গাহস্থ্য জীবনের যে রূপক ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে সেকালের ভদ্রেতর সমাজের একটা ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করা যাবে।'

চর্যাগীতিপদাবলী আবিষ্কারের ফলে বাংলা দেশের প্রাচীন জনমানসের পরিচয় আমরা লাভ করি। বৌদ্ধ সাধন সংগঠন হলেও প্রতীক ও রূপকের যে সাহায্য নিয়েছিলেন সেখানে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, দেশ-কাল, বাসস্থান-জীবনবৃত্তি, ধর্ম, সমাজ ব্যবহার এক

বিরাট চিত্র উঠে এসেছে।

চর্যায় দেশ কালের এক ভৌগোলিক অবস্থান স্থান পেয়েছে। পাহাড়, অরণ্য ও নদীমাত্রিক বাংলার ভূপ্রকৃতি স্পষ্ট। চর্যার অনেক পদে নদ-নদী, নৌকার প্রসঙ্গ আছে যেমন - ৫ সংখ্যক পদে

ভ্বণই গহন গম্ভীর বেবাঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন যাহী।।

৮ সংখ্যক পদ -

সোনে ভরিতী করুণা নারী।
রূপা হোই মহিকে ধাবী।।

১০ সংখ্যক পদে নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহিরি কুড়িআ।

হালো ডোম্বী তো পুছাম সদভাবে।
তাই সসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ।।

আবার ৪২ সংখ্যক চর্যায় -

চি অ সহজে মনে সংপুন্না।
কান্ধবিয়োত্র মা হোহি বিসন্না।।

পদে সাগর ও তার তরঙ্গ ভঙ্গের প্রসঙ্গ দেখতে পাচ্ছি।

নদী সাগরের পাশাপাশি অরণ্য ও পর্বত-টিলার প্রসঙ্গ স্থান পাওয়ায় হেত বঙ্গের কথাই মনে পড়ে। যেমন -

২৮ সংখ্যক পদে -

উষ্ণা পাবত তাঁহি বসই সবরী বালী।

যেমন আছে তেমনি শবরীর বনে বিবরণের কথাও আছে - নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডানী।

একেলী সবরী স বন হিন্ডুই কর্ণ কুন্ডল বজ্রধারী।।

৬ সংখ্যক পদে গহন অরণ্যের কথা -

হরিণী বোলঅ হরিণা সুন হরিআ তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।।

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা চর্যায় স্পষ্ট। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের বসবাস ছিল নগরের বাইরে। উচ্চ ও ধনিক শ্রেণীর বসবাস ছি নগর অভ্যন্তরে। ১০ সংখ্যক চর্যায় (নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।) নগরের কণ্ঠরে ডোম্বীর বাস কিন্তু বাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের সঙ্গ পাওয়ায়র জন্য ঘোরা ঘুরি করে। মানুষের অবৈধ সংস্পর্শের কথা আর গোপন থাকে না। উন্মত্ত শবর শবরীর মদ্য পান ও যৌন সংযোগে রাত্রি যাপনের কথা ২৮ সংখ্যক 'উষ্ণা পাবত তঁহি

টিপ্পনী

বসই সবরী বালী' পদটিতে দেখতে পাই।

জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন বৃত্তি ধারী মানুষের সন্ধান পাচ্ছি, যেমন - কৃষিকাজ, পশুশিকার, মাছ ধরা, তুলোধোমা, নৌকা চালান, চ্যাঙারি তৈরি, মদ চোলাই, বানিজ্যযাত্রা, প্রহরী, কোটাল, দারোগা প্রভৃতি। এছাড়া চুরি, ডাকাতি, জল দস্যুপনা করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করত। এ প্রসঙ্গ গুলি প্রাচীন বাংলার মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল।

টিপ্পনী

চর্যায় সমাজও পারিবারিক জীবনের ছবি আছে। একান্নবর্তী পরিবারের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদী নিয়ে ঘরকন্নার কথা যেমন আছে, তার পাশাপাশি ব্যাভিচারিনী গৃহ বধূর কথা স্পষ্ট। যে বধূ দিনের আলোয় কাউকেও ভয় পায় সেই গৃহ বধূ শ্বশুরকে অন্ধকারে রেখে অবৈধ যৌন মিলনে পা বাড়িয়েছে -

দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভৈলে কামরু জাঅ।।

সমানে চোর ডাকাত নিবারণের জন্য পুলিশ ডারোগা আছে। সমাজ ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার মাঝে শিথিলতার ছবি বর্তমান। পরিভ্রান্ত মানুষের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা চোখে পড়ে। নৃত্যগীত নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বিনোদনের কথা বীণাপাদের পদে -

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোহী।

অবসর সময়ে দাবা খেলার বিবরণ ১০ ও ১২ সংখ্যক চর্যায় ফুটে উঠেছে।

চর্যার সাহিত্য সম্পদ ঃ-

চর্যাপদাবলী বৌদ্ধধর্ম ও তত্ত্বদর্শন বিষয়ক সংগীত হলেও কাব্যরসনোক অধরা মাধুরী নয়। সিদ্ধাচার্যগণ পদ রচনা কালে রূপক প্রতীকের ব্যবহার করতে গিয়ে বাচার্থ ও চিত্র কল্পে পদ গুলি অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র ছন্দ অলঙ্কার ধ্বনি রস আলোচনা করে চর্যার কাব্যমূল্য বিচার করা অসম্ভব। যেহেতু চর্যাপদাবলী সাধন সংগীত সেখানে প্রতীক চিত্রকলা ও বাচ্যাতিরিক কাব্য রসের সন্ধ্যান আবশ্যক। চর্যায় তত্ত্ব দর্শন নিরপেক্ষ যে মানবজীবন লীলা প্রকাশিত তা প্রাচীন বাংলার সাহিত্য সম্পদ স্বরূপ, তার মূল্য অপরিসীম।

চর্যাকারদের লেখনিতে প্রাণচঞ্চল মানব মানবীর প্রেম কথা। নির্জন পর্বতে শবরী বালার বিচরণ, নদীর গহন গম্ভীর বেগে বয়ে যাওয়া, হরিণ-হরিণার নিলয়, দরিদ্রা রসনীয় বেদনা মুখর পদগুলি অতুল। ৫ সংখ্যক পদে 'ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।' পদটিতে নদীমাতৃক বঙ্গভূমির কথা ও তাতে সাঁকো তৈরির বাস্তব চিত্র স্থান পেয়েছে। ৬ সংখ্যক পদে হরিণ শিকারের কথা আছে। হরিণ যে তার নিজের মাংসের জন্যই নিজের শত্রু তা - 'অপনা মাংসে হরিণা বৈরী।' পদে লভ্য। হরিণ-হরিণা আবাস স্থান জানেনা তার উর্ধ্বশ্বাসে অরণ্যে পালিয়ে যায়। এ যেন ভাবনা নন্দের ক্যাম্পে কবিতার ঘাই হরিণী।

চর্যাপদে নিসঙ্গ দারিদ্র্যের চিত্র পাই ৩৩ সংখ্যক চর্যায় টেন্টন পাদের পদে -

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।

হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।।

এখানে এক নিরন্ন গৃহবধূর টেলিয়ে ঘর, প্রতিবেশী হীন জীবন। উদরপূরণের সামর্থটুকু নেই অথচ নিত্য অতিথির যাওয়া আসা। এদিকে সংসারে পুত্র-কন্যা বেড়ে চলেছে। ঘরের গাইটিও বন্ধ্যা এমন এক নিরন্ন গৃহবধূর চিত্র চর্যাকারদের কলমে জীবন্ত প্রাণ। বাংলার সমাজ ব্যবস্থার বেহাল রূপ -

জো যো চৌর, সৌ দুষাধী।
নিতি নিতি ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।

টিপ্পনী

প্রশাসনিক দুর্বলতার চিত্র - যারা চোর তারা কোটাল। এ আঁতাতে ব্যঙ্গরসের সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ হাস্য রস উদ্রেককারী আজও একটি পদ -

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে যাঅ।।

৩৩ সংখ্যক চর্যায় হাস্যরস স্থাবকারী চরণ -

দুহিল দুধু কি বেন্টে যামাঅ।।
বলদ বি আএল গবিআ বাঝেঁ।

আমাদের সমাজে প্রচলিত প্রবাদ প্রবচনের মত জনপ্রিয় কয়েকটি চরণ -

১) অপনা মাংসে হরিণা বৈরী।

২) সরহ ভনন্তি বরসুণ গোহালী কি দুঠ্য বলন্দেং

আত্ম মূল্যায়ণ ধর্মী প্রশ্ন ঃ-

ক) চর্যাপদাবলীর বৌদ্ধ দর্শন ও সাধনতত্ত্বের পরিচয় দাও।

খ) চর্যায় প্রকাশিত সেকালের সমাজ জীবনের পরিচয় দাও।

গ) চর্যাগানের সাহিত্যমূল্য আলোচনা কর।

নির্ধারিত চর্যাগীতির পাঠ ও অলোচনা ঃ-

চর্যা সংখ্যা - ১ [পুথি পৃষ্ঠা ৩/খ]

।।রাগ পটমঞ্জরী - লুই পাদানাম্।।
কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।ধ্রু।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভনই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।ধ্রু।।

সঅল স (সা) হিঅ কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই।।ধ্রু।।
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহু রে পাস।।ধ্রু।।
ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিন্ডি বইঠা।।ধ্রু।।

টিপ্পনী

আধুনিক বাংলা রূপ ঃ- কায়া (রূপ) তরুবর। পাঁচটি ডাল, চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করল। দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই ভনে বেলে, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জান। সকল সমাধি দিয়ে কি হবে, সুখ-দুঃখে নিশ্চিত মরতে হবে। ছন্দের বন্ধন ও করণের (ইন্দ্রিয়ের) পটুত্বের আশা এড়াও (ত্যাগ কর)। শূন্য পক্ষের দিকে ভিড়ে পাশ নাও। লুই ভনে, আমরা ধ্যানে (ইশারায়) দেখেছি। ধমন-চমন (নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস) দুই পিঁড়িতে বসেছি।

মর্মার্থ আলোচনা ঃ-

আচার্য লুইপাদ বললেন আমাদের এই দেহ রতন পঞ্চ শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষের মত, রূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান - পাঁচটি কায়া দরুন শাখা। আমাদের মন প্রকৃতি আভাস দোষে সদা চঞ্চল। এই চাঞ্চল্যের জন্য আমরা দুঃখ ভোগ ও কাল কবলিত হই। তাড়িত মনের কালবোধ থেকে প্রবৃত্তি মূলক সংসার জ্ঞানের উৎপত্তি। চঞ্চল চিত্তকে মহাসুখের অভিসারী করতে হবে, এ কৃচ্ছ্র সাধনে গুরুর নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা ত্যাগ করে বাসনা নিবৃত্তির পথ অবলম্বন আবশ্যক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুয়ের সামরস্যেই সহজানন্দ রূপ মহাসুখ সম্ভব। লুই বললেন - তিনি ধমন (নিঃশ্বাসবাহী নাড়ী) ও চমন (প্রশ্বাসবাহী নাড়ী) নাড়ীর নিম্নগা ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে অবধূতী মার্গে আসীন। এই অবস্থায় সহজ স্বরূপের যুগনদ্ধ রূপ প্রত্যক্ষ করেন।

ভাষাতাত্ত্বিক টীকা ঃ-

বি < অপি (আদি স্বরলোপ)। চীএ, চিও > চীঅ

+ এ (অধিকরণ বিভক্তি) = চীএ।

পইঠো - প্রবিষ্টঃ > পইট্ঠ (সমীভবন) > পঠঠো।

মহাসুহ - < মহাসুখ।

সঅল - < সকল (মধ্য ব্যঞ্জনলোপ)।

সমাহিঅ - সং, সমাধ্যা > প্রা, সমাহিঅ।

সুনুপাখ - < শূন্যপক্ষ।

আম্হে - অস্মাভিঃ > অম্হাহি > অম্হহি > অম্হে > আম্হে।

লনে - < ধ্যান।

চর্যা সংখ্যা - ৫ [পুথি পৃষ্ঠা ৯ / ক-খ]

।। রাগ গুর্জরী চাটিল্লপাদানাম্ ।।
ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন যাহী ।। ধ্রু ।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামিলোঅ নিভর তরই ।। ধ্রু ।।
ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ ।। ধ্রু ।।
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহি দুর ম জাহী ।। ধ্রু ।।
জই তুম্হেলোঅ হে হোইব পারগামী।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী ।। ধ্রু ।।

টিপ্পনী

আধুনিক বাংলা রূপ ঃ-

ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে বয়। দুই প্রান্তে (পাড়ে) কর্দমাক্ত, মাঝে থই নেই। ধর্মের জন্য চাটিল সাঁকো গড়ে, পারগামী লোক নিশ্চিন্তে পার হয়। কাড়া (ছেদন) হল মোহতরু, পাটি জোড়া হল। অদ্বয় দৃঢ় টাঙ্গী নির্বাণে হানা হল। সাঁকোতে চড়লে ডান-বাম হয়োনা। নিকটে বোধি, দূরে না যাও। ওহে, যদি তোমরা পারগামী হবে তাহলে শ্রেষ্ঠ সাঁই (স্বামী) চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর।

মর্মার্থ আলোচনা ঃ-

এখানে 'ভব' কে শ্রোতস্বিনা নদীর প্রতীকে ব্যবহার দেখা যায়। এই প্রবাহিনীর দুই দিকে পঙ্ক রূপ প্রকৃতি দোষ, এর মাঝখানে থৈ পাওয়া যায় না। এই ভব প্রবাহ পার হওয়া অত্যন্ত দুরুহ। চাটিল এই প্রবাহের মাঝে সাঁকো নির্মাণ করে যাত্রার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এতে পারগামীরা নিশ্চয় পার হতে পারবে। প্রাকৃতিক আকর্ষণ ত্যাগ করে অর্থাৎ মোহ তরু ছেদন করে এগোনো যাবে। ডানগা ও বামগা নাড়ীকে শুদ্ধ রেখে সোজা (মধ্যগা দিয়ে) এগোতে হবে। অবধূতিকা মার্গে গিয়ে কুন্ডলিনা শক্তিকে উর্ধ্বগামী করতে হবে, তবেই নির্বাণ লাভ সম্ভব। এর জন্য শ্রেষ্ঠ সাই বা গুরুর নির্দেশিত পথই কাম্য।

চর্যাসংখ্যা - ৬ [পুথিপুষ্ঠ ১১ / ক]

।। রাগ পটমঞ্জুরী - ভুসুকুপাদানাম্ ।।
কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস ।। ধ্রু ।।
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
ঘনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরী ।। ধ্রু ।।
তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জ্ঞাণী ।। ধ্রু ।।

হরিণী বোলঅ হরিণা খুণ হরিআ তো।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।।ধ্রু।।
তরসঁন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুক ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ পইসঈ।।ধ্রু।।

আধুনিক বাংলা রূপ ঃ-

টিপ্পনী

কাকে নিয়ে, কাকে ছেড়ে কিভাবে আছি। চারিদিক বেষ্টন (বেড়ে) করে হাঁক পড়েছে। আপনা মাংসে হরিণ নিজের শত্রু। ভুসুকু ক্ষণেকের জন্যও শিকার ছাড়ে না। হরিণ ঘাস ছোয় না, জল পান করে না। হরিন হরিনীর নিলয় জানে না। হরিণী হরিণ কে বলেং শোন, জুয়াড়ী তুই এ বন ছেড়ে পলাতক হ। ত্রাসে পালানো হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুক ভনে (এ সকল) মূঢ়ের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

মর্মার্থ আলোচনা ঃ-

অবিদ্যার প্রভাব জনিত কারনে আমাদের চিত্ত সর্বদা চঞ্চল, জরা মরণ, সুখদুঃখে পুষ্ট চর্যাকার ভুসুক পাদ এই চর্যায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের চিত্ত কে সাংকৃতিক অবস্থা থেকে পারমার্থিক অবস্থায় উন্মীত করার যে লক্ষ্য তা ব্যক্ত করেছেন। হরিণ হরিণীর রূপকে চিত্তের দুই অবস্থার কথা বলা হয়েছে। হরিণ তার নিজের মাংসের জন্য নিজের শত্রু অর্থাৎ প্রকৃতি দোষে দুষ্ট হয়ে মানুষ তার দুঃখ সাগরে পতিত হয়। সাধক চিত্ত তার পারমার্থিক স্বরূপ বুঝতে পারার পর আহার-পানীয় ত্যাগ পূর্বক নৈবাত্মার বিপদমুক্ত স্থানে যাবার জন্য প্রচেষ্টা। কিন্তু নৈরাত্মা হরিণীর নিরাপদ আবাস ইন্দ্রিয়দ্বারে জানা যায় না বলে সে সন্ধান পায় নি। নৈরাত্মা দেবী তাকে ডেকে বলে - কায়া বন ছেড়ে বনান্তরে যাও, যেখানে মহাসুখে অবস্থান সম্ভব। ছুটন্ত হরিণের খুর যেমন দেখা না, তেমনি তীবগতিতে যখন অবধূতী মার্গে চিত্তের ঊর্ধ্বায়ণ চলে, তখন চিত্তের সাংবৃতিক রূপ আর লক্ষিত হয় না। ভুসুকু বলে যার মূঢ় ধর্মতত্ত্ব থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থান করে তাদের হৃদয়ে এ তত্ত্ব প্রবেশ করে না।

ভাষাতাত্ত্বিক টীকা ঃ-

কাহেরে < কস্য > কাহ + এরে (কর্ম বিভক্তি)

ঘিনি - গৃহ্নীত্বা > ঘিণিআ > ঘিণি।

বেঢ়িল < বেষ্টিতঃ > বেড্ঢিঅ > বেঢ়িঅ + ইল্ল > বেঢ়িল।

হাক - < হাক্ক (অপভ্রংশ)।

চৌদীস - চতুর্দিশ > চউদ্দীক্স > চউদীস।

মারসেঁ - মাংস + 'এন' জাত এঁ (করণে) > মাংসেঁ।

খনহ - ক্ষণস্য > খনস্স (আদ্য ব্যঞ্জন লোপ) > খনহ।

অহেরী – অক্ষবাটিক > আখেটিক > আহেড়ী > আহেরী > অহেরী।

হরিআ – হরিক > হরিঅ (অন্ত ব্যঞ্জন লোপ) > হরিআ।

ভান্তো – ভ্রান্তঃ > ভান্তো।

হিঅহি – হৃদয় > হিঅঅ > হিঅ + হি (অধিকরনে)।

চর্যা সংখ্যা – ৮ [পুথি পৃষ্ঠা – ১৩/খ – ১৪/ক]

টিপ্পনী

।। রাগ দেবক্রী – কম্বলাম্বরপাদানাম্।।
সোনে ভরিলী করুণা নাবী।
রুপা থোই নহিকে ঠাবী।। ধ্রু।।
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ। জেলী
জাম বহুড়ই কইসেঁ।। ধ্রু।। খুন্টি
উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী। বাহতু কামি
ল সদ্গুরু পুচ্ছী।। ধ্রু।।
মাঙ্গত চড়্হিলেঁ চউদিস চাহঅ। কেডুআল নাি
হ কেঁ কি বাহবকে পারঅ।। ধ্রু।। বাম দাহিণ
চাপী মিলি মিলি মাগা।
বাটত মিলিল মহাসুখ সঙ্গা।।

আধুনিক বাংলা রূপ ঃ–

সোনায় ভর্তি করুণা নৌকা। রূপা রাখার ঠাঁই নেই। (নৌকা) বেয়ে যাও কামলি গগন উদ্দেশে। গত জন্ম ফিরে আসে কি করে। খুঁটি উপড়ে কাছি মেলা হল। বেয়ে যাও কামলি সদ্গুরুকে জিজ্ঞাসা করে। গলুইতে চড়ে চারদিকে চায়। কেড়ুয়াল (দাঁড় বা বৈঠা) নেই, কেউ কি বাইতে পারে? বাম ডান চেপে মিলে মিলে চলা। পথে মিলল মহাসুখ সঙ্গ।

মর্মার্থ আলোচনা ঃ– সহজ সাধনার দুরুহ প্রনালী সন্ধ্যা ভাষার আবরণে প্রকাশ করা হয়েছে। এই পদটিতে বাংলা দেশের প্রাচীন বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিক দিকটি সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দিকটি ধরিয়ে দেয়। এখানে সোনা, রূপা শব্দে দুটি শূন্যতা ও রূপ বেদনা – সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে বোঝাচ্ছে। শূন্যতার দ্বারা করুণা নৌকা পূর্ণ হয়েছে। মহাশূন্য লাভেচ্ছায় শূন্য গগনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে গত জন্ম আর ফিরে আসে না। বাসনা বন্ধন মুক্ত হয়ে নির্বান লাভ সম্ভব। অভ্যাস দোষ সমূহ উৎপাটিত করতে হবে। খুঁটি কাঠি পথ স্তব্ধ করে, তাই নৌকা স্তব্ধ হয়ে যায়। সেরূপ প্রকৃতি দোষ ও অবিদ্যা সাধন মার্গের সর্বোচ্চ মহাসুখ লাভের বাধা স্বরূপ। সর্ব বন্ধন মুক্তি করে সদ্গুরুর নির্দেশে চিত্ত নৌকাকে মহা গগনের উদ্দেশে ডান বাম কোন দিকে না দেখে মধ্যা নাড়ী দিয়ে সহস্রায় নিয়ে যেতে হবে।

টিপ্পনী

ভাষাতাত্ত্বিক টীকা ঃ-

সোনে - সুবর্ণ > সোণ + এ (অধিকরণ)

ভরিলী - ভরিত > ভরিঅ + ই ল = ভরিল + ঈ

নাবী - নাব + ইকা > নাবিকা > নাবী

যোই - স্থপ > থব > থো + ই < তি

ঠাবী - স্থায় + ইক > ঠাইঅ > ঠাঈ, ঠাবী (ব-শ্রুতি)

উঠেসেঁ - উদ্দেশেন > উত্রসেঁ > উঠেসেঁ

জাম - < জন্ম।

বহুড়ই - ব্যাঘুটতি > বহুড়ই (ফেরে অর্থে)

উপাড়ী - উৎপাটিত > উপ্পাডিঅ > উপাড়ী

কাচ্ছী - কক্ষিকা > কচ্ছিআ > কচ্ছি, কাচ্ছী

চড়হিলে - অপ ধাতু চড় + ইঅ > চড়ি অ >

চড়িহিঅ + ইল = চড়হিল + এঁ

কেড়ুয়াল - কৃপীটপাল > কঈড়বাল > কেড়আল, কেড়ুয়াল

কেঁ - > কেন

মাগা - মার্গ > মাগ্গ > মাগ + আ = মাগো

সঙ্গা - < সঙ্গ

চর্যা সংখ্যা - ২৮ [পুথি পৃষ্ঠা ৪১/খ - ৪২/ক]

।। রাগ বলাড্ডি - শবর পাদানাম্ ।।
উঁষা উঁষা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জুরী মালী।। ধ্রু।।
উমত সবরো পাগল শবরো মা করগুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দারী।। ধ্রু।।
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কন্ন কুণ্ডল বজ্রধারী।। ধ্রু।।
তিঅধাউ ঘাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো তুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী।। ধ্রু।।
হিঅ তাঁবোলা মহামুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।। ধ্রু।।
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ নিঅ মনে বাণেঁ।

একে সরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ।। ধ্রু।।
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবরসিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ।। ধ্রু।।

আধুনিক বাংলা রূপ ঃ-

উঁচু উঁচু পাহাড়, সেখানে শবরী বালিকার বাস। পরণে ময়ূর পুচ্ছ, শবরীর গলায় গুঞ্জারী মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর গোল (ভুল) কোরোনা, দোহাই ডোমার। নিজ ঘরনীর নাম সহজ সুন্দরী। নানা তরুরর মুকুলিত হল, ওরে ডাল গগনে আগল। একা শাবরী এ বন ঢোঁড়ে, কানে কুন্ডলও বজ্র ধারণ করে। তিন ধাতুর খাট পাতা হল শবর, মহাসুখে শয্যা বিছানো হল। শবর প্রেমিক নৈরামনি প্রেমিকা প্রম রাত পোহাল। হৃদয় তাম্বুল কর্পূর মহাসুখে খায়। শূন্য নৈরামনিকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত কাটায়। গুরু বাক্য পুচ্ছ (বান), বানে নিজ মন বিদ্ধ কর। এক শর সন্ধানে বিদ্ধ, বিদ্ধ কর পরম নির্বান। উত্থত্ত শবর শুরু রোষে। গিরিবরের শিখর সন্ধিতে প্রবেশ করলে শবরকে খুঁ হবে কি ভাবে?

মর্মার্থ আলোচনা ঃ-

উপরিউক্ত চর্যায় শবর শবরীর প্রেম মিলনের রূপকে নৈরাত্ম দেবীর সহায়তায় সাধকের মহাসুখ লাভের নির্দেশ ব্যাখ্যা হয়েছে এখানে। সাধক খোজীর হেদকে পর্বত ও মস্তককে তার শিখরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দেহ পর্বতের উপরি অংশ ঘিরে মহাসুখ চক্রে নিজ গৃহিনী নৈরাত্মা দেবীর অধিবান। নৈরাতন দেবীর ময়ূরপুচ্ছ ও অলঙ্কৃত রূপ দেখে বিষয়শক্তি বজ্রধর নৈরাত্মাকে নিজের প্রেয়সী রূপে চিনতে পারছে না। সর্বগামিনী, সর্ব নৈরাত্মদেবী শবরকে দেখে ভুল না করে, নিজের সহজ সুন্দরীকে চিনে নিতে নিজে পরিচয় দিল। নৈরাত্মা সহজ সুন্দরী জ্ঞানমুদ্রাদিরূপ কুন্ডল কণে ধারন করে বজ্র ও উপায় জ্ঞান অবলম্বন করে যুগনদ্ধ রূপে কার পর্বত বনে বিবরণ করে।

নৈবাত্মা দেবীর নির্দেশে সাধক শবর পরিশুদ্ধ কার-বাক্-চিত্ত-রূপ ত্রি ধাতুর খাট পাড়লেন। তার উপর মহাসুখ লাভের শয্যা পাতলেন। নৈবাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে অবিদ্যা প্রপঞ্চ অন্ধকারে রাত অতিবাহিত হল। তাম্বুল মহাসুখ স্বরূপ কপূরের সঙ্গে আহার করে চিত্তকে ফল হেতু সম্বন্ধ থেকে মুক্ত করলেন। নৈরাত্ম দেবীকে কণ্ঠে (সম্ভোগচক্রে) ধারণ করে মহাসুখ রূপ জ্ঞান শলাকা দিয়ে স্বকায় ক্লেশ রূপী অবিদ্যা নিশি নাশ করলেন। এমন অবস্থায় পৌছানোর জন্য গুরু উপদেশ ধনুক নিজের মন চিত্ত রূপ বাণ জুড়ে এক শর সন্তানে পরম নির্বানকে বিদ্ধ করতে হবে। তাতে অবিদ্যা বাসনা দোষ বিনষ্ট হয়। শবরপাদ ঠিক এভাবেই নির্দেশ পালন করেছে। এবং মহাসুখ চক্ররূপ গিরিশিখরে প্রবেশে তার পরম নির্বান ঘটেছে।

ভাষা তাত্ত্বিক টীকা ঃ-

উঞ্চা - < উচ্চ + আ (স্বার্থে), পাবত - পর্বত > পব্বত > পাবত।

তঁহি - অস্থিন্ > তমহি > তঁহি। বালী - বালিকা > বালিআ > বালী।

গিবত - গ্রীবা > গিব + ত। উমত - উন্মত্ত > উন্মত > উমত।

টিপ্পনী

মৌলিল - মুকুলিত > মউলিঅ > মউলি + ইল = মউলিল।

গরুআ - গুরুক > গুরুঅ > গরুআ।

লোড়ির - < 'লুণ্ঠ' - হাত 'লোড়' + ইতব্য - জাত'ইব' > লোড়িব।

কইসেঁ - কীদৃশেন > কীইসেন > কইসেঁ।

টিপ্পনী

চর্যা সংখ্যা - ৩৩ [পুথি পৃষ্ঠা ৪৮/ক]

।। রাগ পটমঞ্জরী - টেন্টণ পাদানাম্ ।।
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।। ধ্রু।।
বেঙ্গসঁ সাপ বডহিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামাঅ।। ধ্রু।।
বলদ বিআএল গবিআ রাঝেঁ।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে।। ধ্রু।।
জো সো বুধী সৌ নিবুধী।
জো যো চৌর সৌ দুষাধী।। ধ্রু।।
নিতে নিতে ষিআলা ষিহে যম বুঝঅ।
টেন্টণ পা এর গীত বিরলে বুঝঅ।। ধ্রু।।

আধুনিক বাংলা রূপ ঃ-

টোলায় (লোকালয়) আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই, হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য অতিথির আগমন। ব্যাঙ সাপ বেড়ে যাচ্ছে। দোয়া দুধকি (পুনরায়) বাঁটে ঢোকে, বলদ বিয়োল (প্রসূতি) গাই বন্ধ্যা। পাত্রে দোহণ করা হয় তিন সন্ধ্যা। যা সেই বুদ্ধি, তাই নিকুষ্ট বুদ্ধি। যে সে চোর, সেই কোটাল, নিতি নিতি শিয়াল সিংহের সঙ্গে বোঝা। টেন্টন পা এর গীতি সামান্য লোক বোঝে।

মর্মার্থ আলোচনা ঃ-

পদটি প্রহেলিকায় পূর্ণ। টালত মোর ঘর অর্থাৎ মহসুখ চক্রে অবস্থান যেখানে দেহ ভান্ডের সাংকৃতি বোধ মুক্ত। শূন্যতায় ভরে গেছে হৃদয় মহাসুখ লাভ হলে সেখান থেকে আর দেখা যায় না। পরসার্থ তত্ত্ববিদ যোগীরা এরূপ অবস্থায় নির্বিকল্প সমাধিতে নগ্ন থাকেন। সবিকল্প হতান তাদের কাছে নিকৃষ্ঠ। কালযোগীদের চিত্ত সবিকল্প জতানের দ্বারা বিষয় সুখ হরণ করে তাই বোরের সঙ্গে তুলনীয়। অবিদ্যা চিত্ত সর্বদা মৃত্যু এখানে ভয়ে শৃগালবৎ সন্ত্রস্ত। চিত্ত নির্বিকল্প জ্ঞান লাভের হয় কোটাল। টেন্টন পাদের এ তত্ত্বের ভাষা কদাচিৎ বোঝে।

ভাষা তাত্ত্বিক টীকা ঃ-

টালত - টাল + অন্ত-হাত ত > টালত।

ঘর - গৃহক > ঘরক > ঘর।

পড়বেশী - প্রতিবেশী > প্রতিবেশিক > পড়িবেশি অ > পড়িবেশীঅ > পড়বেশী।

হাড়ীত - হন্ডী > হান্ডী > হাঁড়ী > হাড়ী + ত > হাড়ীত।

বেঙ্গ - বিগতাঙ্গ > ব্যঙ্গ > বেঙ্গ।

দুহিল - দুহিতঃ (= দুগ্ধঃ) > দুহিঅ + ইল > দুহিল।

বেন্টে - বৃন্তে > বেন্টে (ঋ > এ, মুধর্ন্যী ভবন)।

যামাঅ - সমায়াতি > সমাআই > সমাই > সামাই > সামাঅ।

দুহিএ - দুহ্যতে (বর্নবাচ্যে) > দুই অই > দুহিএ।

বূধী - < বুদ্ধি। নিবুধী - < নির্বুদ্ধি।

ষিআলা - শৃগাল > শিআল > ষিআল + আ।

ষিহে - সিংহেন > সিহেন > ষিহে।

চর্যা সংখ্যা ৪০ [পুথি পৃষ্ঠা ৫৭/খ]

।। রাগ মালসী গবুড়া - কাহ্নপাদানাম্ ।।
জো মণগোএর আলাজালা।
আগম পোথা টন্টা মালা।। ধ্রু।।
ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জা অ।
কাঅ বাক চিঅ জসু ণ সমাঅ।। ধ্রু।।
আলে গুরু উএসই সীস।
বাকপথাতীত কাহিব কীস।। ধ্রু।।
জেতই বোলী তেতবি টাল।
গুরু বোব সে সীস কাল।। ধ্রু।।
ভণই কাহ্ন জিণরঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা।। ধ্রু।।

আধুনিক বাংলা রূপ ঃ-

যা মনোগোচর (তাই) অমূলক। আগম পুথি মিথ্যামালা। বল কি সে সহজকে বলা যায়। কায়বাক চিত্ত যাতে প্রবেশ করে না। গুরু শিষ্যকে বৃথা উপদেশ দেয়। বাক্য পথের অতীত তা কিভাবে বলা যাবে? যতই বলি ততই ভুল। গুরু বোবা, শিষ্য সে কালা। কাহ্ন বলে জিনরত্ন কেমন? কালার বোবাকে বোঝানো যেমন।

টিপ্পনী

মর্মার্থ আলোচনা ঃ-

চর্যাকার বলছেন – যা সনের দ্বারা বোঝা যায় তা বৃথা। তন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞান, পুথি, ইষ্টের মালা সব কিছুই ব্যর্থ, সহজানন্দ কে অভিব্যক্তি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কায়, বাক চিত্ত যার মধ্যে প্রবেশ করে না, তার পথ নির্দেশ বৃথা। যা বাকপথাতীত তাকে গুরুই বা কিভাবে প্রকাশ করবেন? সহজানন্দ বা মহাসুখ অনুভবে গুরু মুকের মত নির্বাক এবং শিষ্য বধিরের মত বাহ্য সংবেদন রহিত। এই পদে সাধক কাহ্নপাদ দার্শনিকের মত তার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।

টিপ্পনী

ভাষা তাত্ত্বিক টীকা ঃ-

জো – < যঃ

মনগোএর – মনগোচর > মনগোএর।

আলাজালা – < অল্ (+ বারণ করা বা মিথ্যা প্রমাণ করা) + ঘঞ্

= আল (= মিথ্যা, অমূলক) + জাল (বিস্তার)

= আলজাল > আলজালা।

পোথা – পুস্তক (সং) > পোত্থঅ > পোথা।

টন্টামালা – টন্টা = মিথ্যা বা চালাকি, এবং + মালা।

বোলবা – বোল্ (< < কৃ + অব (>) (তব্য) = বোলব।

আলে – আলেন > আলেঁ > আলে (অল্ + ঘঞ্ = আল)।

উএসই – উপদিশতি > উঅইসই > উএসই।

সীস – শিষ্য

কাহিব – কথয়িতব্য < কহইঅব্ব < কহিব < কাহিব।

কীস – < কীদৃশ।

তেতবি – তৎ + তক তেত্তঅ > তেত + বি < অপি = তেতবি।

টাল – < টল্ + ঘঞ্ টাল (= ভুল)

সংবোহিঅ – < সংবোধিত।

জইসা – যাদৃশ্য > জইস।

চর্যা সংখ্যা – ৪১ [পুথি পৃষ্ঠা ৫৮/খ]

।। রাগ কহ্নু গুঞ্জরী – ভুসুকুপাদানাম্।।
আইএ অনু অনা এ জগরে ভাংতিএ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই ষারে কিং তং বোড়ো খাই।। ধ্রু।।

অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহ্না।
আইস সহাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট বাষণা তোরা।।ধ্রু।।
মরুমরীচি গন্ধ নইরীদাপণ বিম্বু জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা।।ধ্রু।।
বাংদ্ধি সুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।
বালুআতেলেঁ সখরসিংগে আকাশে ফুলিলা।।ধ্রু।।
রাউতু ভণই কট ভুসুক ভণই কট সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্ছাসি ভান্তী পুচ্ছতু সদ্গুরুপাব।।ধ্রু।।

টিপ্পনী

আধুনিক বাংলা রূপ ঃ-

ওরে, আদিতে অনুৎপন্ন এ জগৎ, ভ্রান্তিতে সে প্রতিভাত। রজ্জু সাপ দেখে যে চমকায়, তাকে কি বোড়া খায়? ওরে আকাট (মুর্ঘ) যোগী হাত লোনা কোরো না। এ রকম স্বভাতে যদি জগৎ কে বুঝিস তবে তোর বাসনা টুটবে। মরুমরীচিকা গন্ধর্বনগরী দর্পণ বিশ্ব যেমন, বাতাবর্তে দৃঢ় হওয়া আপন পাথর যেমন। বন্ধ্যাপুত্র যেমন কেলি করে, খেলা করে বহুবিধ খেলা, বালুকায় তেলে মাশকের শৃঙ্গে ফুলের আকাশে। রাউত বলে নিশ্চিত ভাবে, ভুসুকু ভনে নিশ্চিতভাবে সকলের স্বভাব এই প্রকার। যদি তুই মূঢ় ভ্রান্তিতে থাকিস, তবে সদ্গুরুকে জিজ্ঞাসা কর।

মর্মার্থ আলোচনা ঃ- আলোচ্য চর্যায় ভুসুকু পাদ তত্ত্ব-দার্শনিকে দৃষ্টিভঙ্গীতে যেন সংগীত বচনা করেছেন। জগৎ-সংসার, রজু-সাপ, মরুমরীচিকা, প্রসঙ্গ এনে জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্যের মত সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে গেছেন। মায়াময় জগৎক্ষে ভ্রম বলে কল্পনা করে ইন্দ্রিয়কে সরবত করে শূন্যে চালিত করে মহাসুখ লাভের পথ বাতলেছেন, জগৎসংসার সম্পর্কে আমাদের অনুভব রজ্জুতে সর্প দর্শনের মত ভ্রান্ত। রজ্জু সর্প নয়, রজ্জু রূপ সর্প দংশন করেনা কিন্তু পার্থিব মানুষ ভ্রান্তি বশত চমকে উঠে। তেমনি জগৎ সম্পর্কে কোন জ্ঞানের প্রতীতি হলেও লব্ধ জ্ঞানের প্রকৃত কোন ক্রিয়া নেই। শিষ্যদের তাই উপদেশ হাত নোনা না করা হয় অর্থাৎ সংসারে আসক্ত না হওয়া। মরুভূমির মরীচিকা, গন্ধর্বগরী, দর্পণের প্রতিবিম্ব এদের কোন অস্তিত্ব নেই, জগৎও তেমনি। জগৎ সংসার মিথ্যা মায়া মাত্র।

ভাষা তাত্ত্বিক টীকা ঃ-

আইএ - আদি < আই + এ (অধিকরণ বিভক্তি)

অনুঅনা - অনুৎপন্ন > অণুপ্পন্ন > অনুঅনা।

পড়িহাই - < প্রতিভাতি।

বোড়ো - < বোড্র।

লোহিত - লোহ্ + অন + আ।

সহাবেঁ - < স্বভাবেন।

জই - < যদি।

টিপ্পনী

গন্ধ – গন্ধব > গন্ধঅ > গন্ধ।

নইরী – নগরী > নঅরী > নইরী।

দাপণ বিম্বু – < দর্পণ বিম্ব।

বাংদ্বিসুআ – < বন্ধ্যিকাসুত।

বালুআ-তেলে – < বালুকা তৈলেন।

ফুলিলা – ফুল্লিতঃ > ফুল্লিঅ > ফুলিঅ + ইল > া > ফুলিলা।

রাউতু – রাজপুত্র > রাঅউত্ত > রাউত > রাউতু।

কট – < কৃতং (নিশ্চিতভাবে)।

সঅলা – < সকল।

পুচ্ছতু – পুচ্ছ + তু।

চর্যা সংখ্যা ৪২ [পুথি পৃষ্ঠা ৬০/ক]

।। রাগ কামোদ – কাহ্নপাদানাম্।।
চিঅ সহজে শুণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএ মা হোহি বিসন্না।।ধ্রু।।
ভণ কইসে কাহ্নু নাহি।
ফরই অনুদিনং তৈলোএ পমাই।।ধ্রু।।
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সাঅর।।ধ্রু।।
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ণ পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড ণচ্ছন্তেঁ দেখই।।ধ্রু।।
ভব জাই ণ আবই এসু কোই।
আইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই।।ধ্রু।।

আধুনিক বাংলা রূপ ঃ–

চিত্ত সহজ অবস্থায় সম্পূর্ণ শূন্য। স্কন্ধ বিয়োগ বিষন্ন হোয়ো না। বল কিসে কাহ্ন নাই। ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে অনুদিন প্রকাশ। মূঢ় দৃষ্টকে নষ্ট দেখে কাতর। ভগ্ন তরঙ্গ কি সাগর শোষক? মূঢ় থাকলেও দেখতে পায় না। দুধের মধ্যে ননী থাকলেও দেখা যায় না। এভাবে কেউ যায় না আসে না। এই ভাবে বিলাস করে যোগী কাহ্ন।

মর্মার্থ আলোচনা ঃ–

চিত্ত সহজ অবস্থায় সব সময় শূন্য। দেহের বিনাশে বিষাদ গ্রস্থ হওয়ার কোন কারন নেই। মানব মন সহজাবস্থায় পৌঁছালে সে বুঝতে পারে জগতের অনিত্যতা। দেহের বিনাশ সাধন

মানে সত্ত্বার বিলুপ্তি নয়। পুল বিন্দু যেমন সমুদ্রে মিশে গিয়ে সর্বত্র পরিব্যপ্ত হয়, দেহও বিলিন হয়ে ক্ষুদ্র সত্তা বিলোপে বিশ্বসত্তার প্রকাশ পায়। পার্থিব বস্তুর বিনাশে মূঢ়রাই কাতর হয়, জ্ঞানীরা মহাসুখ লাভে মগ্ন থাকে। দুধের মধ্যে যেমন ননী মিশে থাকে, তাকে দেখে সনাক্ত করা যায় না, তেমনি আত্মা দেহ ছাড়লেও বিনষ্ট হয় না তা অবিনশ্বর।

ভাষা তাত্ত্বিক টীকা ঃ-

টিপ্পনী

সংপুন্না - < সম্পূর্ণ

কান্ধবিয়োত্রঁ - < স্কন্ধবিয়োগেন।

বিসন্না - < বিষন্ন (অর্ধতৎসম)।

ফরই - < স্ফুরতি।

তৈলোএ - < ত্রৈলোক্য।

নাঠ - নষ্ট > ণট্ঠ > নাঠ।

কাঅর - < কাতর।

ভাগ - ভগ্ন > ভগ্গ > ভাগ (তরঙ্গ)

সোষই - সোখই - শুষ্যতি > সুস্সই > সোসই

অচ্ছন্তে - অচ্ছ (< অস্) + অন্ত (শতৃজাত) + এঁ = অচ্ছন্তেঁ (শতৃজাত অসমাপিকা)

আবই - আয়াত > আঅই > আবই (ব-শ্রুতি)

কোই - < কোহপি।

আইস - < অবাদৃশ।

কাহ্নিল - কাহ্ন (< কৃতে) + ইল (সন্দ্রসে)।

চর্যা সংখ্যক - ৪৯ [পুথি পৃষ্ঠা ৬৭/ক]

।। রাগ মল্লারী - ভুসুকুপাদানাম্।।
বাঙ্ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
আদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।। ধ্রু।।
আজি ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চন্ডালেঁ লেলী।। ধ্রু।।
ডহি জোপঞ্চ পাটণ ইন্দিবিস আ ণঠা।
ণ জানমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা।। ধ্রু।।
সোণ রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহানেহে থাকিউ।। ধ্রু।।
চউকোড়ি ভন্ডার মোর লইআ সেস।

জীবন্তে মইলেঁ নাহি লিশেষ ।।ধ্রু।।

আধুনিক বাংলার রূপ ঃ-

বজ্র নৌবহর পদ্মাখালে বাওয়া হল। নির্দয় দঙ্গালে (বাঙ্গালে) দেশ লুঠল। ভুসুকু, চন্ডালে নেওয়া নিজ ঘরণী আজ বাঙালী হল। দগ্ধ হল পঞ্চপওন (নগর), ইন্দ্রিয়ের বিষয় (সম্পত্তি) নষ্ট হল। না জানি চিত্ত মোর কোথায় গিয়ে প্রবেশ করল। সোনা রূপা আমার কিছু থাকল না। নিজ পরিবারে মহাস্নেহে থাকলাম। চতুষ্কোটি ভান্ডার আমার নিঃশেষে নিল। জীবন-মরণে প্রভেদ নেই।

টিপ্পনী

মর্মার্থ আলোচনা ঃ-

চিত্তের মহাসুখব্যবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই পদে বলা হয়েছে প্রজ্ঞারূপ পদ্মাখালে বজ্র বা শূন্যতা রূপী নৌকা চালনা হল। প্রজ্ঞা ও উপায়ের অভেদ মিলন সাধন সম্ভব হল। চন্ডাল ও বাঙ্গালের দ্বারা অবিদ্যা ও মায়া খন্ডিত হল। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয় সমূহ বিনষ্ট করা হল। মায়া প্রপঞ্চ, আসক্তি বিলান হয়ে সর্বশূন্য পারসার্থিক নিজ পরিবারে লীন হয়ে ভুসুকু মহাসুখে নিমগ্ন। যেখানে - জীবন-মরণের কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভাষা তাত্ত্বিক টীকা ঃ-

বাজ - < বন্দ্র।

নাবপাড়ী - < নাব-পাটিকা, নৌবহর।

অদয় - দয়াহীন।

দঙ্গালে - দস্যু, ভবঘুরে, পাঠান্তর 'বঙ্গালে'।

লুড়িউ - < লুণ্ঠিত।

বঙ্গালী - বঙ্গাল + ঈ (স্ত্রীপ্রত্যয়)

ভইলী - ভবিত (= ভূত) > ভইঅ + ইল = ভইল + ঈ।

চন্ডালেঁ - চন্ডালেন।

লেলী - লভিতঃ (= লব্ধঃ) > লইঅ + ইল = লইল > লেল + ই (স্ত্রী প্রত্যয়)।

ডহি - দহিত (= দগ্ধ)

সোণ - < স্বর্ণ

রুঅ - < রূপ

কিম্পি - < কিমপি

চউকোড়ি - < চতুষ্কোটি

আদর্শ প্রশ্নমালা ঃ

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য রচিত চর্যাগীতির আবিষ্কারের ইতিহাস ও গুরুত্ব বুঝিয়ে দাও।

২. চর্যাপদাবলীর পুথির পরিচয় জ্ঞাপন করে সংকলনের প্রকৃত নাম নির্দেশ কর।

টিপ্পনী

৩. চর্যাগীতিতে যে বৌদ্ধ সাধন তত্ত্ব প্রতিফলিত তা উদ্ধৃতি সহ আলোচনা কর।

৪. চর্যাগীতি পদাবলীর সাহিত্য সম্পদ উদাহরণ সহ পর্যালোচনা কর।

৫. চর্যাগীতিতে প্রাচীন বাংলা দেশের সমাজ জীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও।

৬. 'কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল' পদটিতে বৌদ্ধ দর্শন ও সাধনার গোপন কথা আছে তার ব্যাখ্যা কর।

৭. শবর পাদের 'উঞ্চা পাবত তাঁহি বসই সবরী বালী।' – পদটির তত্ত্বরূপ ও কাব্যসৌন্দর্য্যের পরিচয় দাও।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় – বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথমখন্ড,

নির্মল দাশ – চর্যাগীতি পরিক্রমা,

মণীন্দ্রমোহন বসু – চর্যাপদ।

সুকুমার সেন – চর্যাগীতিপদাবলী।

সুকুমার সেন – বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথমখন্ড)।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী – হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বংশীখন্ড ও রাধাবিরহ) ঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত

টিপ্পনী

২.১.১. ভূমিকা

২.১.২. উদ্দেশ্য

২.১.৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার, রচনাকাল ও নামকরণ

২.১.৩. ক) পুথি আবিষ্কার

২.১.৩. খ) রচনাকাল ও নামকরণ

২.১.৪. কাহিনীবয়ন ও কাব্য পরিচিতি

২.১.৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাদি আলোচনা

২.১.৫. ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতত্ত্ব

২.১.৫. খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছন্দ

২.১.৫. গ) অলঙ্কার ব্যবহার

২.১.৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরাণ ও 'গীতগোবিন্দম্' এর প্রভাব

২.১.৬. ক) পুরাণের প্রভাব

২.১.৬. খ) গীতগোবিন্দের প্রভাব

২.১.৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সমাজ সচেতনতা

২.১.৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে 'বংশীখন্ড'

২.১.৮. ক) বংশীখন্ডে নাটকীয়তা ও গীতিধর্মিতা

২.১.৯. চরিত্র বিশ্লেষণ

২.১.১০. রাধা বিরহ

২.১.১১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ কি প্রক্ষিপ্ত?

২.১.১২. রাধাবিরহের গীতিমূর্চ্ছনা।

২.১.১৩. চরিত্র বিশ্লেষণ

২.১.১৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলীর রাধা

২.১.১. ভূমিকা ঃ

টিপ্পনী

চর্যা পরবর্তী আদি-মধ্য যুগের প্রামান্য একমাত্র নিদর্শন বড়ু চন্ডিদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যের জয়দেবের 'গীত গোবিন্দম্' কাব্যের ব্যাপক প্রভাব এ কাব্যে লক্ষিত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যটি রাধা-কৃষ্ণ বড়ায়ি এই ত্রয়ী চরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছে, দুটি কাব্যের বিষয় বস্তু শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের প্রেম লীলাকে কেন্দ্র করে রচিত। 'গীত-গোবিন্দম্' দ্বাদশ সর্গে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ত্রয়োদশ খন্ডে বিভক্ত (১২টিতে খন্ড যুক্ত হলেও শেষ অধ্যায় খন্ড শব্দটি বিযুক্ত)। এছাড়া উভয় কাব্যে তাল, লয়, রাগ-রাগিনীর উল্লেখ বর্তমান। দুটি কাব্যর্থ 'নাটগীতি' মূলক আছে গীতি রসের ধারা।

আদি মধ্যযুগের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', এই কাব্যটি বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া হেলার কাঁকিল্যা গ্রামের অধিবাসী শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচায় ধামাভর্তি পুঁথির মধ্য থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খীষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় নিজ সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পুঁথিটি প্রকাশ পায়। আদি-মধ্য-অন্তের কিছু পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। খন্ডিত পদ সহপুঁথির পদের সংখ্যা - ৪১৮, সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা - ১৬১। প্রধান তিনটি চরিত্র ছাড়া ও নারদ, কংস, যশোদা, নন্দ, আইহন, আইহনের মা, বলন্দ্র, গোপনারীগণ ও দেবতাগণ উল্লেখ বর্তমান। জন্মখন্ড থেকে রাধাবিরহ পর্যন্ত অংশে রাধা-কৃষ্ণ বড়াই এর উক্তি প্রত্যুক্তিতে আখ্যানটি সচল। ঘটনার উত্থান-পতন মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব সংঘাত কাব্য টিকে আধুনিক মনস্ক করে তুলেছে।

২.১.২. উদ্দেশ্য ঃ

আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিক-নির্দেশী নিদর্শন বড়ু চন্ডীদাস কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি, পন্ডিত কবি বড়ু চন্ডীদাস রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্য তথা আপানর বাঙালীকে উপহার দিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। গীতগোবিন্দমের কবি রাধা-কষ্ণের প্রেমলীলাকে আঁকতে গিয়ে লৌকিক ধারাটি আত্মসাৎ করেছিলেন। তেমনি বড়ু চন্ডীদাস পৌরাণিক ও লৌকিক ধারাকে গ্রহণ করে লৌকিক মানব-মানবীর উচ্ছল জীবন কথাকে কামনার সাগরে ভাসিয়েছেন। রাধা-কৃষ্ণের চরিত্রের মধ্য দিয়ে বড়ু চন্ডীদাস সমাজ জীবন ও মানব জীবনকে প্রাধান্য দিলেন। একথাও ঠিক এক সময় এ কাব্য পাঠ করে ঈশ্বর তত্ত্বের রসাস্বাদন করা হত। কাব্যটি বাংলা সাহিত্যে অভিনব এর ভাষাতাত্ত্বিক দিক শুধু নয় কাহিনীর অভিনবত্ব, ছন্দ, অলঙ্কারগত দিক দিক দিয়েও অনণ্য।

২.১.৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কার, রচনাকাল ও নামকরণ ঃ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের প্রাচীন বাংলার নিদর্শন চর্যাপদ। তারপর বাংলা সাহিত্যের অনুর্বর পর্ব বা অন্ধকার ময় যুগ। ঠিক এর পরে মধ্যযুগের শুরুতে পাচ্ছি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক গুরুত্বপূর্ণ কাব্যটি। আদি-মধ্যযুগের একমাত্র নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। কাব্যটির রচয়িতা কবি বড়ু চন্ডীদাস। তাঁর সৃজনশীলতা সংস্কৃতে ব্যৎপত্তি সর্বোপরি পৌরাণিক বিষয় নিয়ে লোক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এক নতুন বিষয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

টিপ্পনী

২.১.৩. ক) পুথি আবিষ্কার ঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার সম্পর্কে জানা যায় বাংলা ১৩১৬ সালে (ইং ১৯০৯) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের নিকট কাঁকিল্যা গ্রামের অধিবাসী শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশোদ্ভূত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরের মাচার উপর থেকে ধামার মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার করেন। পুথি রচয়িতা বাসলী সেবক বড়ু চন্ডীদাস। বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় নিজের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশ করেন। পুথির ভিতরের কয়েকটি পৃষ্ঠা খন্ডিত এবং আখ্যাপত্র ও পুষ্পিকা না থাকায় রচনাকাল পুথি নকলের তারিখ জানা যায় নি।

২.১.৩. খ) রচনাকাল ও নামকরণ ঃ

চর্যাপদের পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। রচনার সময়কাল আদি-মধ্যযুগ অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের শুরুতেই বলে মনে হয়। রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১৮ সালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি পরীক্ষা করে মন্তব্য করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি ১৫শ শতাব্দীর শেষ লগ্নে অনুলিখন হয়েছে। ড: নলিনীকান্ত ভট্টশালী বিষ্ণুপুরাণের পুথির অক্ষরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অক্ষর মিলিয়ে স্থির করেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি ১৪৫০-১৫০০ খীষ্টাব্দের মধ্যে অনুলিখন হতে পারে। ড: সুকুমার সেনের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি ১৬০০ খীষ্টাব্দের পাশাপাশি অনুলিখিত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পুথি পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ১৫৫০ খীষ্টাব্দের দিকে লেখা হয়ে থাকতে পারে। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য - 'মধ্যযুগের প্রারম্ভ কালের (১৫শ শতক) অল্প পরে বা ১৫শ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচিত হইয়া ছিল বলিয়া অনুমিতি হয়।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পর সময়কাল, কবি ও ভাষা নিয়ে যেমন আলোড়ন তুলেছিল, তেমনি তার নামকরণ নিয়েও সমস্যা দেখা যায়। এই প্রাচীন কাব্যটির প্রথম দিকের কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া না যাওয়ায় প্রকৃত নাম জানা যায় না। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নামকরণ সম্পর্কে ভূমিকায় লিখলেন - 'দীর্ঘকাল যাবৎ চন্ডীদাস বিরচিত 'কৃষ্ণকীর্তন' -এর অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এত দিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুথিই 'কৃষ্ণকীর্তন' এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দেশ করা হইল।'

সম্মতি আপত্তি সব কিছু নিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি সকলেই মেনে নিয়েছেন। নামকরণ

নিয়ে এক টুকরো কাগজ বা চিরকুট বিতর্ক আরো জোরালো করে তোলে। টুকরো তুলোটি কাগজে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লেখাটি দেখে মনে হয় গ্রন্থটির নাম 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব্ব'। পুথির ১৬ খানি পত্র ধার নেওয়ার কথা এই চিরকুটে লেখা ছিল। চিরকুটটি এবং অনুমানের উপর নির্ভর করে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' নামটি গ্রহণ করার পক্ষপাতী। পুথির প্রথম দিককার পৃষ্ঠা, পুষ্পিকা যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে তত দিন প্রকৃত নাম পাওয়া সম্ভব নয়। আর এ বিতর্কের ও অবসান অসম্ভব।

টিপ্পনী

২.১.৪. কাহিনীবয়ন ও কাব্য পরিচিতি ঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাস, সংস্কৃত সাহিত্যের কবি 'গীত গোবিন্দম্' কাব্যের লৌকিক রাধা কৃষ্ণের অনুকরণে রসময় আখ্যানটি গড়লেন। খন্ডিত পদ সহ ৪১৮টি পদ, ১৫১টি সংস্কৃত শ্লোক, ৩২টি রাগ রাগিনী তাল সহ ১৩টি খন্ড, তিন (৩) মূল চরিত্র (রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি) এবং অন্যান্য চরিত্র নিয়ে কাব্যটি রচিত। জয়দেবের কাব্য দ্বাদশ সর্গে এবং বড়ু চন্ডীদাসের কাব্য ত্রয়োদশ খন্ডে বিভক্ত। মূলতঃ তিনটি চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে নাট্য গুণ প্রকাশিত। এছাড়া গীতি প্রবণতা, নিসর্গ বর্ণনা কাব্যের সাহিত্য গুণকে বর্ধিত করেছে। সুকুমার সেন মহাশয় জানালেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগীতি কাব্য ধারা অর্থাৎ কতকগুলি ছোট ছোট নাট্য গীতির মালা। রচনার গঠন হইতে মনে হয় আসলে এটি ছিল চিত্রনাট্য বা পাঞ্চালিকা নাট্য অর্থাৎ পুতুল নাচের কতকগুলি পালা, গান গুলির মাথায় রাগ তাল ছাড়া ও অন্য কিছু নির্দেশ আছে। এ নির্দেশ ঠিক অভিন্যয়র নয়, পুতুল নাচের সঙ্গে গীত-অভিনয় রীতির নির্দেশ।'

দীর্ঘকায় কাব্যটি ১৩টি খন্ডে বিভক্ত, তবে শেষ খন্ডটিতে 'খন্ড' শব্দটি যুক্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের তিনটি চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি, সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীর ধারা সবল। 'জন্মখন্ড' সৃষ্টি রক্ষার্থে অত্যাচারী, দুর্বিনীত কংস হত্যার প্রয়োজনে, সকল দেবতা সভা ডাকলেন -

সঙ্গেই চিন্তাআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ।।
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে।।
তোহ্মে নানা রূপেঁ কইল অসুরের খএ।
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ।।
হেন স্তনী ঈসত হাসিআঁ ততিখনে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারাথনে।।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলরাম এবং কৃষ্ণ বনমালী রূপে দৈবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করবে। কৃষ্ণই অত্যাচারী কংসের বিনাশ সাধন করবে। 'জন্মখন্ডে' নারদের উপস্থিত বেশ কৌতুক কর। এই খন্ডে লক্ষীর আবির্ভাবের কথা জানা গেল -

কাহাঞিঁর সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীকে বুলিল দেবগণে।।

'তাম্বুলখন্ড' - এই খন্ডে বড়ায়ির তত্ত্বাবধানে 'সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী' রাধা ও অন্যান্য সকল সখীগণ মিলে দুধ বিক্রয়ের জন্য মথুরা গমন। এক দিন বয়সজনিত চাপল্যে সখীদের সঙ্গে

রঙ্গরসিকতা করতে গিয়ে বন মধ্যে পথ ভ্রষ্ট হল। গোয়ালিনী রাধা বকুল তলাতে এসে দেখল বড়াই বুড়ি ও সঙ্গ ছাড়া, তখন ভয়ে 'বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।' অপর দিকে রূপসী রাধাকে না দেখে বড়াই চিন্তান্বিত –

'নাতিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে।' পথে রাখাল বনমালীর সঙ্গে বড়াইয়ের সাক্ষাৎ, বড়াই তার প্রিয় নাতনীকে খুঁজে দেওয়ার জন্য বললে কৃষ্ণ তার রূপ বর্ণনা করতে বলেছে। তার মুখে রূপ লাবন্যের কথা শুনে কৃষ্ণ নিজেকে স্থির থাকতে পারল না। পরে বড়াইকে প্রেম নিবেদনের জন্য দৌত ক্রিয়ার কথা জানাল। কৃষ্ণ প্রেরিত তাম্বুল পদদলিত করে রাধিকা বড়াইকে চপেটঘাত করতে ছাড়েনি।

পূর্ব কর্মের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য 'দানখন্ডে' কৃষ্ণ দানী সেজেছে। এগার বছরের বালী রাধার কাছে বার বছরের দান চেয়েছে কৃষ্ণ। নব যৌবনা রাধার রূপ যৌবন আকাঙ্খা করেছে। কৃষ্ণ রাধার সামী সম্পর্ক অস্বীকার করে জানিয়েছে – 'তোক্ষে লক্ষমী রাধা এবেঁ আক্ষে হরি কাহ্নে।।' রাধা সখেদে নিজের রূপ যৌবনের প্রতি কটাক্ষ করে জানিয়েছে –

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপনার মাঁসে হরিণী জগতে বৈরী।।

রাধার পথ রুদ্ধ করে কৃষ্ণ মিলিত হয়েছে, এখানে কৃষ্ণের গ্রাম্য রাখাল চরিত্রের রূপটি বেশি করে ফুটেছে। 'নৌকাখন্ডে' ছল, চাতুরী কৌশলে দেহ মনের পরিবর্তনে ভবিষ্যতে কৃষ্ণ পাগলিনী রাধার পথ উন্মুক্ত হল। দান খন্ডে কৃষ্ণের উৎপীড়নে রাধা মথুরা গমন বন্ধ করেছে। এমন অবস্থায় কৃষ্ণ ও বড়াই ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বড়াই কৌশলে রাধাকে যমুনার ঘাটে নিয়ে আসলে কৃষ্ণ সেখানে ঘাটোয়াল সেজে অপেক্ষায় রত। একা নৌকায় পার করার সময় দুই যুবক-যুবতী যমুনার উত্তাল তরঙ্গ ভাদ নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে। নৌকা খন্ডেই অনিচ্ছা সত্বেও পরিবেশ এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে রাধা এই প্রথম নিজে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ধীরে ধীরে কৃষ্ণের প্রতি রাধামন এক সুখী হয়ে উঠেছে।

'ভারখন্ডে' স্থল পথে রাধা মথুরা নগরে যাত্রা করেছে। পথে ক্লান্ত রাধার মজুরিয়া হিসাবে ভারী কৃষ্ণের উপস্থিতি। ছলাকলা কুশলী রাধা কৃষ্ণকে রতি মিলনের প্রতিশ্রুতি দিলে সানন্দে ভার বহন করেছে। 'ছত্রখন্ডে' রাধা হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জাগ্রত কিন্তু বেশ ছলনাময়ী নারীর লক্ষণ বর্তমান। কৃষ্ণকে সুরতির আশ্বাস দিয়ে ছত্র ধারণ করিয়েছে। 'বৃন্দাবন খন্ডে' রাধার চিন্তায় নন্দের নন্দন জানিয়েছে –

কেমনে জায়িবোঁ বড়ায়ি তার বৃন্দাবনে।
মনত শুনিআঁ বোল উপায় আপনে।।

এখন ইচ্ছা করলে স্ত্রীরাধিকা ঘরের বাইরে পা রাখতে পারে না। সমাজ সংসার শাশুড়ী বড় ভয় আছে। এই পর্বে রাধা বড়াইকে মথুরার হাটে যাওয়ার পরিকল্পনা জানায়। সখীদের সঙ্গে রাধা চন্দ্রাবলী গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে। বৃন্দাবনের পথে রাধা কৃষ্ণকে দেখে কাম কলা নিপুণা রমনীর মত আচরণ করেছে। গীতগোবিন্দের মতো এখানে রাধার মান ভঞ্জনের পালা লক্ষ্য করা যায়। বৃন্দাবনের ফুল বাসরে উভয়ের মিলন সাধিত হল।

'কালীয় দমন খন্ড ঃ' এ কৃষ্ণের জল কেলির ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে। এই পর্বে সমাজ লোকলজ্জা

টিপ্পনী

ভূলে রাধা কৃষ্ণকে 'পরাণপতী' সম্বোধন করেছে। 'যমুনাখন্ডে' রাধা ও সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলকেলি সংঘটিত হয়েছে। এখানে বস্ত্রহরণ, হার চরির ঘটনা ঘটেছে। যমুনান্তর্গত হার খন্ডে রাধা সাতেনরী হার ফিরে না পেয়ে যশোদার কাছে কৃষ্ণের নামে নালিশ জানিয়েছে। এর দলে কৃষ্ণ রাধার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'বাণখন্ডে' বড়ায়ির সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করে রাধাকে পুষ্পবণে আঘাত হানতে বদ্ধ পরিকর। এই বীতরাগ পরবর্তী সময়ে তীবরূপ ধারণ করেছে। এই পর্বে পুষ্পশরে আহত রাধাকে দেখে কৃষ্ণের প্রতি বড়াইর খেদোক্তি করে পড়েছে। অবশেষে রাধার চেতনা ফেরানো এবং মিলন ঘটেছে।

টিপ্পনী

'বংশীখন্ডে' কৃষ্ণ রাধাকে মোহিত করার জন্য মোনহর বাঁশি নির্মাণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ রাধার সামনে না এসে নেপন্যে বাঁশী বাজিয়ে হৃদয় হরণ করেছে। বাঁশির শব্দে রাধিকার সমাজ-সংসার হৃদয় ভেসে গেছে। এই পদ গুলিতে রাধা হৃদয়ের হাহাকার সংগীতময় হয়ে উঠেছে। সাংগীতিক মূচ্ছর্না বিরহ্নীকে গৃহ ছাড়া করে ছেড়েছে। 'নিন্দউলী' মন্ত্র দিয়ে কৃষ্ণকে নিদ্রহত করে বড়াইর নির্দেশে বাঁশি চুরির ঘটনা নিদ্রা থেকে জেগে প্রিয় বাঁশি না পেয়ে বনমালীর আকুল হয়ে কান্না ('মাথাত হাথ দিআঁ কাদন্তি গদা ধরে।') সরল বালক কৃষ্ণের কথা সমরণ করায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্বশেষ অবশটি 'রাধাবিরহ' এই অংশে খন্ড শব্দটি বিযুক্ত। কৃষ্ণ অদর্শনে বিরহ-বিধুরা রাধা হৃদয়ের কথা বড়ু চন্ডীদাস কুশলী শিল্পীর মত এঁকেছেন।

২.১.৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাদি আলোচনা ঃ

সাহিত্যের বিচারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অপূর্ব কাব্যরস মন্ডিত। তেমনি ভাষার বিচারে তর গুরুত্ব অপরিসীম। আদি মধ্য যুগের বাংলা ভাষার নিদর্শন এই গ্রন্থ খানিতে বর্তমান। বড়ু চন্ডীদাসের মতো উচ্চ প্রতিভা সম্পন্ন কবির হাতে কাব্যটি সুষমামন্ডিত হয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের ফলে চর্যা পরবর্তী সাহিত্যের নিদর্শন যেমন পাওয়া গেল তেমনি আদি-মধ্যযুগের ভাষার গতিবিধি ও বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারাটি উঠে আসল।

২.১.৫. ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতত্ত্ব ঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তদ্ভব শব্দের ব্যাপক ব্যবহারের পাশা-পাশি আরবী, ফারসী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। দেশী শব্দ কোল গোষ্ঠীর শব্দ, দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর শব্দ কাব্য দেহে স্থান করেছে। যেমন -

দেশী শব্দ - ছোলঙ্গ, টলে, টাভা, টেন্টন, টোইন, ঠেঁটা, পোটলী, ডাকর, ডলে, ডুলি, ডুবিআঁ

অস্ট্রিক শব্দ - তাম্বুল, পানে, কদলী, ডমরু, লগুড়, গুআ < গুবাক (অস্ট্রিক)।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর শব্দ - অনল, কলি, চন্দন, চূড়া, পণ, নীর, ময়ূর, মাল, মুক্তা, বলয়া, পিক, মীন।

আরবী-ফারসী শব্দ - মজুরী, কাসান, পসরা, বাকী, মজুরিয়া।

আদি-মধ্যযুগের কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য ঃ

ক) শ, স, ষ -র স্বেচ্ছাধন ব্যবহার - সুণহ, ষেষ, সশুর, সুন

খ) চন্দ্রবিন্দুর ব্যাপক ব্যবহার – দেখিতেঁ, পাওঁ, চাহোঁ, যবেঁ, করিলোঁ, বেলোঁ, তবেঁ, বারেঁ, তথাঁ, জলেঁ, দেবেঁ

গ) শব্দের অন্ত্যে অ-কারের উচ্চারণ বর্তমান।

ঘ) মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রয়োগ – অক্ষি, তোক্ষা, কাহ্নঞি, কথাহোঁ ইত্যাদি।

ঙ) ই, ঈ এবং উ, ঊ প্রয়োগে তেমন কোন নিয়ম অনুসৃত হত না – আখী, ঊড়ী, ঊজল, সিতল, সিশের, তীন প্রভৃতি।

চ) দন্ত্যন, মূর্ধণ্য ণ ব্যবহারেও নিয়মের শিথিলতা লক্ষিত হয় – মণ, কেমণে, আণি, পুণী, কোণ, কাঁহিণী ইত্যাদি।

ছ) শ্রী লিঙ্গ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী বাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হত – অনাথী, গোয়ালিনী।

জ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' প্রাণী বাচক শব্দের সঙ্গে – সব, গণ, জন, রা, এরা যোগ করে বহুবচনের পদ গঠিত হত – গোপীজন, দেবগণ, আঞ্জারা অপ্রাণীবাচক শব্দে গণ শব্দ যোগে বহুবচন – আভরণগণ, প্রণামগণ, বাদ্যগণ।

ঝ) কর্তৃ কারকের বিভক্তি – শূন্য, এ, এঁ, ঞেঁ, ঞঁ।

কর্ম কারকের বিভক্তি – শূন্য, ক, কে, রেঁ, এ

করণ কারকের বিভক্তি – শূন্য, এ, এঁ, ঞঁ, এত, এঁ হে।

সম্প্রদান কারকের বিভক্তি – শূন্য, ক, কে, রে, রেঁ, এরে।

সম্বন্ধ কারকের বিভক্তি – র, এর, আর, কের, কার।

অধিকরণ কারকের বিভক্তি – এ, এঁ, ঞ, এতে, ক, ত, ডে, য।

ঞ) অনুসর্গের ব্যবহার – ঠাই, দিয়া, পাত্র, পানে, পাশে, প্রতি, বিণা, কারণ, ভীত, মাঝেঁ, সাযে, সহিত।

১) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাংলা ভাষার শব্দদ্বৈত ও ধনাত্মক শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয় –

অ) শব্দ দ্বৈত ঃ খনে খনে, ঘন ঘন, দিনে দিনে, নিতি নিতি, মনে মনে, পাছে পাছে, চলিতেঁ চলিতেঁ, বার বার, না জীবোঁ না জীবোঁ, খন্ড খন্ড প্রভৃতি।

আ) ধন্যাত্মক শব্দ – আনচান, রুনুঝণু, খলখলি, টলবল।

২.১.৫. খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছন্দ ঃ

পয়ার ছন্দের প্রাধান্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মূল। কিন্তু তৎসঙ্গে ত্রিপদী ও দুর্লভ নয়। ছন্দের ক্ষেত্রে স্বরধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে মাত্রার তারতম্য দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সময় কালে – আট-ছয় মাত্রার দ্বিপদী রূপটি বাংলা কাব্যে রূপলাভ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের

টিপ্পনী

ছন্দ বৈচিত্র্যে পয়ারের বিভিন্ন প্রকরণ বাংলা ছন্দের পরবর্তী কালের বীজ বপন করে রেখেছিলেন বড়ু চন্ডীদাস। পয়ার ছন্দে প্রকরণগুলির দিকে তাকালে দেখবো চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার, বিষ্ম অক্ষরী পয়ার, দশ অক্ষরের পয়ার, এগার অক্ষরের পয়ার, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, ভঙ্গ ত্রিপদী, চৌপদীর ব্যবহার চোখে পড়ে।

চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার –

কোন সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহিঁজান এ বেঁ তোঁ আপনার নাশ।। (জন্ম খন্ড)

টিপ্পনী

দশ অক্ষরের পয়ার, ১০ – ১০ – ১০ মাত্রার ত্রিতক শ্লোক –

এ জন্মে বা না করিলোঁ ভাগ।
হারায়িলোঁ কা-হ্নের লাগ।
আর তার না পায়িবো লাগে।। (রাধা বিরহ)

আট-ছয়-আট মাত্রার ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি –

মো হবেঁ জানিতোঁ হেন / করিবেঁ তোল।
তবেঁ না সিতোঁ এ বাটে।
নাহিঁ যাইতোঁ দধি দুধ / বিকশিতেঁ ল।
কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে।। (বৃন্দাবন খন্ড)

আট – আট – দশ মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী ঃ

হারায়িল তোঙ্গার বাঁশী / তেঁসি বড়াইতে হাসী
মোর বোল মুণ চক্রপাণী।
বুলি চৌর পৈসে ঘরে / গিহ্রীক সত্ত্বর করে।
হেন দুধি বড়ায়ির বাণী।।

তোক্ষাতে মজিল মন / ভালে জাণে দেগণ
ইতে কিছু নাহিঁক সন্দেহা।।

চৌপদী ছন্দের ব্যবহার –

সরস বসন্ত কালে
কোকিলের কোলাহলে
এ নতা যৌবন কাহ্নিঞিঁ / প্রাণরে।

২.১.৫. গ) অলঙ্কার ব্যবহার ঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ু চন্ডীদাস যে সকল অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন তার আলোচনা আবশ্যক। বড়ু চন্ডীদাস উপমা অলঙ্কারের পাশাপাশি নিশ্চয়, রূপক, অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক প্রয়োগ করেছেন। শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে উপমার ব্যাপক প্রয়োগ –

শ্রীকৃষ্ণের কাছে রাধা রূপের বর্ণনায় বড়াই –

'কেশপাশেঁ শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর। সজল জলদে যেহ্ন – উইল নবসূর।
কনক কমল রুচি বিমল বদনে। দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে।।'

প্রকৃতি ও শ্রীরাধিকা রূপ এক হয়েগেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে –

'কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে। সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে।।
কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহারে। অভিমান পা আঁ পাকা দড়িম ফিরে।।'

কৃষ্ণের মুখে প্রিয় রাধিকার বর্ণনা –

শরত উদিত চান্দ বদন কমল।
খঞ্জুন জিনিআঁ তোর নয়ন যুগল।।
আধরে বন্ধুলী রাগ শোভ এ সুন্দরী।

উপমা অলঙ্কারের এ যেন চন্ডীকালের স্বাভাবিক ব্যবহার।

উপমার পাশাপাশি নিশ্চয় অলঙ্কারের উদাহরণ – পাখি জাতি নহোঁ বাড়ায়ি উড়ী পড়ী যাওঁ।

অনুপ্রাণ অলঙ্কারের ব্যবহার –

নিন্দ এ চান্দ চন্দন রাধা সবখানে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে।।

আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন ঃ–

ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার ও নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাংলা ভাষা আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা এ বিষয়ে আলোকপাত কর।

গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-অলঙ্কার বিষয়ে প্রবন্ধ লেখ।

২.১.৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরাণ ও 'গীতগোবিন্দম্' এর প্রভাব ঃ

বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' পুরাণ, ভাগবত, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' এবং ভিনিন্ন লোক উপাদন সংমিশ্রিত হয়েছে। কাব্যের কাব্য কাহিনীতে বিষ্ণু পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশ, ধ্বন্যালোক, ব্রহ্ম সংহিতা প্রভৃতির প্রভাব বর্তমান।

২.১.৬. ক) পুরাণের প্রভাব ঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্ম খন্ডে দেবতাদের বসুধা রক্ষার জন্য শ্রী হরির কাছে প্রার্থনা, বলরাম ও কৃষ্ণের জন্মগ্রহণ প্রভৃতি কাহিনী বিষ্ণুপুরাণ, মৎসপুরাণ ও ভাগবতের আদর্শে রচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত

টিপ্পনী

পুরাণে রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী এক। কাব্যের জন্মখন্ডে যে নারদ চরিত্রটি তা পুরাণাশ্রিত। নপুংসক আইহনের রানী রাধা –

দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী।।

রাধা-কৃষ্ণের মামী-ভাগিনের যে সম্পর্ক তা ব্রহ্মবৈবর্তের লোক প্রচলিত কাহিনী থেকে চন্ডীদাস গ্রহণ করেছেন। ত্রয়ী চরিত্রের বড়াই চরিত্রটি সম্পর্কে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য –

টিপ্পনী

'হয়তো দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমতম্', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' বা জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণরত্নাকরে'র কুটনী চরিত্রের আদর্শে তিনি বড়াই চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।'

কাব্যের দানখন্ডে আগমনপুরাণ ও তন্ত্রশস্ত্রাদির প্রভাব আছে। ভাগবতের সাদৃশ্যে রাসলীলা অর্থাৎ বৃন্দাবন খন্ডে রাসের বর্ণনা দেখা যায়। এছাড়া সহস্র গোপিনী, বহুমূর্তি সংহতকরণ, রাধার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ ও বস্ত্রহরণ ভাগবত অনুসরণে রচিত।

তাম্বুলখন্ডে রামায়ণের প্রসঙ্গ –

আযোড় যোড়ন আক্ষে করিবাক পারি।
সেকি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী।.

কালীয় দমন খন্ডে –

শ্রীরাম রূপেঁ তোক্ষে বধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধ রূপে ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরগুন।

এরকম অজস্র উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যাবে।

২.১.৬. খ) গীতগোবিন্দের প্রভাব ঃ

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যে ১২টি সর্গ বর্তমান। প্রতিটি সর্গের পৃথক পৃথক নাম ও রাগ রাগিনীর উল্লেখ আছে। বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ১৩টি খন্ড আছে প্রতিটি খন্ডে আছে নাম ও রাগ-রাগিনীর উল্লেখ। কাব্য কাহিনীর বিষয় থেকে শুরু করে বহু পদের ভাব রূপের প্রতিধ্বনি দেখা যায়। 'তাম্বুল খন্ড' থেকে 'রাধাবিরহ' পর্যন্ত জয়দেবের গীত-গোবিন্দের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

দান খন্ড – নীল উতপল তোর নয়নে।
এহাত মোর পঞ্চলাখ দানে।।

গীত গোবিন্দের দশম সর্গে এ রকম পদ দেখতে পাই –

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনম্।
ধারায়তি কোক নদ রূপম্।।

[তোমার নীল-নলিনাভ নয়ন এখন কোকনদ (রসালপম) রূপ ধারণ করেছে]

নৌকাখন্ডে ও গীতগোবিন্দের প্রভাব লক্ষিত। যেমন –

মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমতী হার।।

গীত গোবিন্দের সপ্তম সর্গে অনুরূপ পদ –

ঘটয়তি মুঘনে কুচরূপ পদ –

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগ নয়নে মৃগমদরুচিরূযতো।
মনিসরসমলং তারকপটলং নঘপদশশি ভূষিতে।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবন খন্ডে গীতগোবিন্দের বহুপদের ভাষানুবাদ দেখা যায়। যেমন –

এযা আন সন্ধে আন্ধে দেবী।
অমৃতেঁ সিঞ্চিউ দুই আখী।।

গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গে – 'অহমিহ নিবসামি মাহি রাধামনুনয় মদ্ববনেন চানরেখাঃ।'

একটি উৎকৃষ্ঠ পদ –

তোক্ষার নয়ন মলিন নলিন
ধরে কোকনদ রূপে।
মদনবাণে কৃষক রহিতলে
ই এ তোর আনুরূপে।

গীতগোবিন্দের দশম সর্গে – অনুরূপ পদ –

নীল নলিমাভমপি তন্বি তব লোচনম্।
ধাবয়তি রোকনদ রূপম্।
কুসুম-শর-বান-ভাবন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণসিদমেতদনুরূম্।।

[তোমার নীল-নলিনাভ নয়ন এখন কোকনদ রূপ ধারণ করেছে। মদনেং রাণরূপে ঐ আঁখি যদি আমার কৃষ্ণ দেবকে অনুরক্ষিত করতে পারে তবে তার রূপান্তর গ্রহণের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।]

গীতগোবিন্দের বহুপ্রচলিত বহুশ্রুত একটি পদের উদ্বৃতি চন্ডীদাসের কাব্যে ও সুচারু ভাবে উপস্থাপনা –

মদনসারল খন্ডন রাধা
মাথার মন্ডন মোর।
চরণপল্লব আরোপ রাধা
মোর মাথার উপরে।।

গীতগোবিন্দে – 'সমর-গরল-খন্ডনং মম শিরসি মন্ডনম্ দেহি পদ-পল্লবমুগরম্।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাধাবিরহ' অংশে ও জয়দেবের প্রভাব সমান ভাবে চলেছে –

টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে -

তনের উপর হারে।
আল মান এ যেহেন ভারে।
অতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে।।
গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গে আছে -
'স্তন বিনিহিত মপি হারমুদারম।
সা মনুতে রশতনুরিব ভারম।।'

টিপ্পনী

গীতগোবিন্দের উপর রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রভাব যেমন পড়েছে তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গীতগোবিন্দর ব্যাপক প্রভাব বর্তমান। আখ্যান থেকে রাগরাগিনী ত্রয়ী চরিত্রের নির্মাণ। রূপ ও দেহ বর্ণনা অলঙ্কার সব মিলিয়ে গীতগোবিন্দের ব্যাপক প্রভাব থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়ু চন্ডীদাসের নব সৃষ্টি এক স্বর্ণ প্রতিমা।

২.১.৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সমাজ সচেতনতা ঃ

চর্যাগানে তৎকালীন প্রাচীন বাংলা ও সমাজ জীবনের অপ্রতুল নয়। চর্যা পরবর্তী কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তৎকালীন দেশ কাল সমাজের ছবি যেমন আছে তেমনি মানব হৃদয়ের বিচিত্র লীলাময়তা ধরা পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সমকালীন গ্রাম্য জীবন ধারার সঙ্গে শিথিল যৌন জীবনের চিত্র পাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ধর্মাশ্রয়ী কাব্য হলেও বড়ু চন্ডীদাসের হাতে উত্তর ভারতের গোপ সম্প্রদায়ের ও বাংলা দেশের পারিবারিক ও সামাজিক দিকটি উঠে এসেছে। রাধিকার বিবাহ হয়েছে বয়জ্যেষ্ঠ আইহনের সঙ্গে। তখন রাধিকা বালিকা মাত্র। বয়সের দিকে তাকালে বোঝা যায় সে যুগে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। সে সময়ে গৃহবধূ যত্রতত্র একাকী ঘুরে বেড়ানোর অধিকার ছিল না। স্বামী শ্বশুর, শাশুড়ীর বিশেষ অনুমোদনের সঙ্গে বিশ্বস্থ কোন আপন জনের প্রয়োজন হত।

গোয়ালা জাতির মহিলারা দুধ-দইয়ের পসরা নিয়ে হাটে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। সচরাচর ঘরের বাইরে না বেরোলেও জীবিকার প্রয়োজনে দলবেঁধে তাদের পসরা সাজিয়ে হাটে যাওয়ার বিষয় পাচ্ছি। এক সঙ্গে কলসী নিয়ে পুকুর বা নদীতে জল নিয়ে আসার কথা পাচ্ছি কাব্যে। যেমন -

শোভন কলসী করে ধরিআঁ
পারিলোঁ যমুনা নীরে।।
অথবা
যাই জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় বঙ্গে।।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে শুধু গোপ সম্প্রদায় নয় - তেলী, কুমোর, নাপিত, ভারী, পাটনী নানান বৃত্তিজীবির পরিচয় পাই।

তেল বিক্রির প্রসঙ্গে তেলীর প্রসঙ্গ –

'কান্ধে করুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।'

কুমোরের প্রসঙ্গ বার বার উঠে এসেছে। কুমোরের বিষয় কবি বড়ু চন্ডীদাস হৃদয় ঘটিত ব্যাপারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এঁকেছেন –

'মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ভারখন্ডে' 'মজুরিআঁ' বা 'ভারী' প্রসঙ্গে অবতারনা –

'এক মজুরিআ আন বহু দধিভার।'

এই ভার বাহকের কথা শুধু উত্তর ভারত নয় গ্রাম বাংলার তাদের দেখা মেলে। নদীমাতৃক বাংলা দেশে নৌকা পারাপারের জন্য পাটনী বা ঘাটোয়ালের প্রসঙ্গ পাচ্ছি।

বন্ধনশালার দিকে তাকালে খাদ্যরসিক বাঙালীর খাদ্যাভাসে যে তালিকা তার বিবরণ চোখে পড়ে। আহারের প্রধান ভাত, তৎসঙ্গে শাক, নিমঝোল, পটল ভাজা, অম্বলের কথা আছে। ভাতের সঙ্গে লেবু এবং সবশেষে গুয়া পদনের প্রসঙ্গ অতিথি বৎসল বাঙালী আনারই অনুরূপ। বংশী খন্ডে রন্ধন প্রণালীর উল্লেখ –

'আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ। সাকে দিলোঁ কানাআঁ পাণী।।'

তা সুনিআঁ ঘৃতে সো পরলা বুলিআঁ। ভজিলোঁ এ কাঁবা গুআঁ।।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোল ঘেপিলোঁ। বিনিহলে চড়াইলোঁ চাউল।।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নারী সমাজের বিশেষ রীতি নীতির উদাহরণ দেখতে পাই। মঙ্গল ঘট পেতে কামনা-বাসনা পূর্ণ করার প্রসঙ্গ সে যুগে ছিল। কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য রাধা যমুনার তীরে কদম্বতলে নিজ মদ্দলার্থে মঙ্গল ঘাটের কথা –

যমুনার তীরে বড়াই কদমে তলে।
পূর্ণঘট পাতী বড়ায়ি চাহিত মঙ্গলে।।

এছাড়া আরো কিছু গ্রামীন সংস্কার আমরা দেখতে পাই। হাঁটি, টিকটিকি বিষয়ক –

কোন অসুভ খণে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী-জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ।।
শুন কলসী লই সখি আগে জাএ।
বাঞঁর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ।।

বড়ু চন্ডীদাস যে সমাজ সচেতন বা লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের প্রয়োগে বোঝা যায়। সে কালে দিন-ক্ষণ, তিথি-নক্ষত্রের বাছবিচার ছিল। যেমন –

শুভ তিথি বার শুভক্ষণে। আল
অতিশয় উল্লাশিত মনে।। ল বড়ায়ি
বন্দিআঁ সব দেবগণে। আল

টিপ্পনী

বড়ায়ি শ্রীরাম চরণে।।
অথবা –
শুভ যাত্রা করি রাধা কর মনোবল।
তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব সফল।।

এছাড়া মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তুক্‌তাক্ প্রভৃতি বিশ্বাসের কথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে স্থান পেয়েছে –

নিন্দাউলী মন্ত্রে যাক (তাক) নিন্দাইব আক্ষি।
তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুক্ষি।।

টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গ্রাম্য কথাবার্তা, মেয়েলি সমাজের ভাষা সহ গ্রাম্য গালিগালাজ, অশ্লীল উক্তি ও স্ফূলরসের পরিচয় মেলে। যেমন –

ক) 'নাটকী গোয়ালী ছিনারী পদমরী।
সত্তে ভায নাহিঁ তোরে।'

খ) যবে মো চুরি কৈলোঁ হআঁ নারীসতী।
তবেঁ কাল সাপ খাই এ আজিকার রাতী।।

২.১.৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে 'বংশীখন্ড' ঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'বাণখন্ডে' শ্রীকৃষ্ণ বড়ায়ির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে রাধাকে পুষ্পবাণে আহত করা তা দেখে বড়ায়ের কৃষ্ণকে ভৎর্সনা। কৃষ্ণও অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে। রাধা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য একমুখী এই একমুখীনতাকে তীব্রতর করার জন্য বংশীখন্ডের সংযোজনা ছিল আবশ্যক। 'বংশীখন্ডে' মধুরধ্বনিতে রাধাকে সম্মোহিত করার উদ্দেশ্যে অতিমোনহর 'বংশী' নির্মান করেছে কৃষ্ণ। বাঁশিটির গড়ন সম্পর্কে বড়ু চন্ডীদাসের বিবরণ –

সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপম।
সুবন্ধের সান্বী হিরার বান্ধিল কাম।।

এমন সুবর্ণগঠিত বাঁশি নিয়ে কৃষ্ণ অলক্ষ্যে থেকে বাঁশির সুরে রাধা হৃদয় হরণ করেছে। এ পোড়া বাঁশি শুধু রাধা, রাধা নামে বেজে চলেছে। প্রকৃতিতে তখন ঘোর বসন্ত বিরাজ করছে তাই প্রিয় কৃষ্ণের বাঁশি ধ্বনি কানে প্রবেশ করলে রাধা মিলনে উৎসুক হয়ে উঠেছে।

বাঁশির সুমধুর ধ্বনিতে জগৎ সংসার মোহিত হয়েছে। রাধিকার শরীর মন উঠেছে উতলা-চঞ্চল। রাধা ব্যাকুলতা জন্য বড়াইকে উদ্দেশ্য করে জানায় –

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর সাবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।

শ্রীরাধিকার কাছে সমাজ-সংসার ব্যর্থ হয়ে গেছে। গৃহ কর্মে আজ আর তার মন নেই শুই বাঁশির ধ্বনি প্রাণে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ সদ্দ পাওয়ার জন্য আজ চঞ্চল। দিবস রমনী তার

কাছে শ্যামময়। তাই অম্বল রান্না করতে গিয়ে ঝাল মশলা, শাকে দেওয়া হচ্ছে কানাভর্তি জল, আর বিনা জলে চড়ানো হল চাল –

'ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ।
বিনি জলেঁ চড়াইলোঁ চাউল।।'

কৃষ্ণ ছাড়া জল হীন মীনের অবস্থা আজ রাধিকার, তার হৃদয়ে প্রবল স্কন্ধের তরঙ্গ উঠেছে কিন্তু রাধা সব বাধা, সমাজভীত লোকলজ্জা সতীত্বের সংস্কার পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ আকর্ষণে দুর্বার গতিতে এগিয়ে গিয়েছে। গভীর ভাবে প্রেমিক পুরুষকে পাওয়ার জন্য তার কাতর নিবেদন –

টিপ্পনী

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।।'

এত হৃদয় যন্ত্রনা সত্বেও কৃষ্ণ অলক্ষে থেকে বাঁশির ধ্বনিতে তাকে আরো উতলা করে তুলেছে। কৃষ্ণ ছাড়া তার জীবনের সার্থকতা নেই –

'এ রূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকা ওঁ।।'

মৃত্যুর কথা শুনে স্নেহশীল বড়াই যেতর আগমনের কথা বলে আশ্বস্ত করেছে।

বড়াই ও রাধার পরামর্শ কৃষ্ণকে পাবার পর 'নিন্দাউলী' মন্ত্র দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে মেনেহর বাঁশিটি চুরি করতে হবে। কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ 'নিন্দাউলী' মন্ত্রের প্রয়োগ এবং পরিকল্পনা মাফিক বাঁশি চুরি করে কলসীতে লুকিয়ে রাখা। নিদ্রাভঙ্গের পর কৃষ্ণের প্রিয় বাঁশির সন্ধান না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে –

চারিপাশ চাহী বাঁশী না পায়ি আঁ
কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ।।

এখানেই শান্ত নয়, সকলের কাছে বাঁশির জন্য ব্যাক্যুল হয়ে বলতে লাগল এবং বাঁশি না পেয়ে শেষে –

'মাথাত হাথ দিআঁ কান্দতি গদাধরে।'

এমন উৎসুক একাগ্র অবস্থা দেখে রাধা হৃদয়ে ভীতির জন্ম হল। বড়ই ও রাধা তার বাঁশি ফিরিয়ে দিল তবে শত সাপেক্ষ। যখন তার (বনমালী) বিরহে রাধা আকুল হয়ে প্রার্থনা করবে তখন যেন তার দেখা পায়। এ সত্য পালনে কৃত –

'আর তোর অর্হিত না করে বনমালী।'
'বংশীখন্ডে' বংশী ব্যাকুলা রাধার কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

২.১.৮. ক) বংশীখন্ডে নাটকীয়তা ও গীতিধর্মিতা ঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটগীতি জাতীয় রচনা মধ্যযুগের ধর্ম বিষয়ক আখ্যান হলেও মানবিক আবেদন

ও চরিত্রের হৃদয় দ্বন্দ্ব ও ঘটনাগত দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। বড়ু চন্ডীদাসের কাব্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দয়ের নাট গীতির যে ঠাট তা বর্তমান। এয়ী চরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে নাটকীয় বা গতি পেয়েছে। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যকের কানাই এর নাট্যশালায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন কোন অংশের পুতুল নাচের অভিনয় দেখেছিলেন। বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' এবং কবি কর্ন পুরের শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকং গ্রন্থে পার্ষদ সহ দাসলীলা অভিনয়ের ঐতিহাসিক বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনী বরনা, বরিত্র পরিকল্পনা সম্পূর্ণ মৌলিক।

টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'বংশীখন্ড'টি বেশ নাট্য রস সমৃদ্ধ। নাট্য রসের সমস্ত উপাদান এতে আছে। 'সাহিত্য প্রকরণ' গ্রন্থে ড: হীরেণ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য - 'প্রাচীন পুথি অনুসারে বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।' সুকুমার সেন বলেছেন - 'নাট্যগীতি পঞ্চালিকা।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা কৃষ্ণ ও বড়াই এই ত্রয়ী চরিত্রের কথোপকথণ, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্ব নাট্য রস ঘনীভূত হয়েছে, অম্বুল খন্ড থেকে নাট্য কাহিনীর যাত্রা শুরু। তাম্বুল দানখন্ড ও নৌকাখন্ডে নাট্যরস অধিক জমে উঠেছে। বিশেষ করে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যেকার টানাপোড়েন বাদ বিতন্ডাই এই নাট্য রসকে তীব্রতর করেছে।

'বংশীখন্ড' নাটকীয়তায় বর্ণবহুল পর্ব। সুদৃশ্য বাঁশির শব্দে রাধা উন্মাদিনী কৃষ্ণ এখানে অলক্ষ্যে। নাটকীয়তা সৃষ্টি নতুন কৌশল। বাঁশির শব্দ তার জীবনের স্থিতাবস্থা নষ্ট করেছে। বাঁশির শব্দে রাধার হৃদয় দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে। তার তাপিত হৃদয়ের অবস্থা -

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।।

তুষাগ্নির আগুণের মত রাধা হৃদয় আহর্ণিশ দগ্ধ হচ্ছে। পরকীয়া প্রেমের ক্ষেত্রে যে সমাজ ভীতি লোক লজ্জা আছে তারই টানাপোড়েন নাটকীয়তায় প্রাণ পেয়েছে। মোনহর বাঁশি চুরির পরিকল্পনা, কৃষ্ণের আর্তি নাট্যগুণ সম্পন্ন। প্রতিটি চরিত্র সংলাপের মধ্য দিয়ে জীবন্ত এবং উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

গীতি প্রবণতা ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নাট্যধর্ম ও গীতিধর্ম আছ সমান ভাবে। মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যই গেয় কাব্য এর প্রতিটি পদের প্রথমে রাগ ও তালের নির্দেশ সূচক দেওয়া আছে। অনেকে মনে করেন একাব্যে ঝুমূর বা জাগের গানের প্রভাব পড়েছে। ড: দূর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেছেন - 'এই কাহিনী বিবৃত হয়েছে অপূর্ব নাটকীয়তার সঙ্গে গীতি রসের সঙ্গে যুক্ত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে তাই আখ্যানরস, নাট্যরস ও গীতিরসের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে।' সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গীতি প্রবণতা পরিদৃশ্যমান। 'বংশীখন্ডে' কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী রাধিকার আত্মহাহাকারে আধুনিক গীতি কবিদের সুর ধ্বন্বিত।

'বংশীখন্ডের' পদগুলি আধুনিক গীতি কবিদের কোন অংশে কম নয়। বড়ু চন্ডীদাস তাঁর কাব্যে বাঁশির শব্দে আত্মহারা রাধার হৃদয় কথাকে সংগীতে রূপ দিয়েছেন -

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

এ পদগুলি সংগীত মুখর হয়ে রাধিকার একান্ত হৃদয়ের অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছে। যা সর্বকালের হৃদয় সংবাদী হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে রাধার হৃদয়-মন যেমন চঞ্চল

তেমনি তার 'আউলাই লোঁ রান্ধন।' বাঁশি সুমধুর সুর রাধিকার হৃদয়ে প্রবেশ করে তাকে আত্মসমর্পণের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। কৃষ্ণকালার কাছে আত্মসমর্পণের সুর –

'দাসী হআঁ তার পা এ নিশিবোঁ আপনা।'

৩১১ নং পদে রাধার কামনাতুর হৃদয় কথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমের গভীর অরণ্যে পথ হারিয়েছে, আর তা বাঁশির জন্যই –

চান্দ সুরুজের ভেদ না জানো চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বি নি মোর এবেঁ এক ঘন এক কুল যুগ ভাএ।
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরি আঁ কাহ্ন গেলা কোন দিশে।।

আষাঢ় – শ্রাবণ মাসের মতো তার দু চোখে ধারা প্রবাহিত। হৃদয় বিদারী বাঁশির শব্দে রাধা হৃদয়ের অবস্থা –
নান্দের নন্দন কাহ্ন আড় বাঁশী বা এ যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।।

'বংশী খন্ডে' বিরহিনী রাধা যখন বলে –

কাহ্ন বিনি মোর রূপ যোবনে কী।।
এ রূপ যৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ।
মেদিণী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।।
উত্তম গীতিধর্মী লক্ষণ আমাদের বিস্মিত করে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশী খন্ডে রাধার হৃদয় কথা বড়ু চন্ডীদাস কুশলী শিল্পীর ন্যায় সংগীত মূর্চ্ছনায় ব্যঞ্জিত করেছেন। এ সুরই আধুনিক গীতি কবিতার জয় যাত্রায় শুভ সূচক বলা যেতে পারে।

২.১.৯. চরিত্র বিশ্লেষণ ঃ

বড়ু চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তিনটি চরিত্রকে জীবন্ত রূপে আঁকলেন। তাদের মধ্যে রাধা চরিত্রকে বিশেষ মমতা দিয়ে গড়লেন, যা এই কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এছাড়া কৃষ্ণ ও বড়াই চরিত্র দ্বয়ও কাব্যের আখ্যানে গুরুত্বপূর্ণ।

রাধা চরিত্র ঃ- বড়ু চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা চরিত্র অঙ্কন করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর। পূর্ণাঙ্গ মানবী রূপে গড়ে তোলার জন্য রাধাকে মনস্তত্ত্ব সম্মত ভাবে উপস্থাপন করেছেন আমাদের সামনে। অগার বছরের 'বালী' থেকে কিভাবে দেহ চেতনার পথ ধরে প্রেমময়ী নারী হয়ে উঠল তার বিকাশোন্মুখ দিক গুলি বড়ু চন্ডীদাস নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। প্রথমে কৃষ্ণের প্রতি বীতরাগ থাকলেও ধীরে ধীরে সে পরিণত হয়েছে কৃষ্ণানুরাগিনীতে।

'জন্মখন্ডে' রাধা-কৃষ্ণের জন্ম বৃত্তন্ত বর্ণিত। 'তাম্বুলখন্ড' থেকে চরিত্র ত্রয়ীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঞ্জীবিত। এই খন্ডে বড়াই এর মুখে রাধা রূপের বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। কৃষ্ণের পাঠানো তাম্বুল কর্পূর পদদলিত করে কৃষ্ণের প্রেমকে অস্বীকার করেছেন। 'দানখন্ডে' এসে রাধা কৃষ্ণের কাছ থেকে নিজেকে যতদূর সম্ভব রক্ষা করার

টিপ্পনী

চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করে রাধাকে সম্ভোগ করেছে গোঁয়ার কৃষ্ণ। কিন্তু সেখানে রাধার কোন জৈব-মানসিক সম্পর্কের স্থান নেই। তবে পরবর্তী কালে নৌকাখন্ড, বৃন্দাবণখন্ড বার বার দেহ মিলনের মধ্য দিয়ে তার মনে কৃষ্ণ কামনা প্রাপ্তি ঘটেছে। বংশীখন্ডে এসে আইহ্ণের প্রেম নিরস জীবন তার কাছে মূলহীন তাই কৃষ্ণে প্রাপ্তি একমাত্র কামনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশি হৃদয় মন হরণ করে নিল। বাঁশি শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে বড়াই বাঁশি উদ্দেশ্যে বড়াইকে বলে ওঠে -

কেনা বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশি বাএ বড়ায়ি এগোঠ গোকুলে।।

কৃষ্ণ মুরলী রাধার চোখে ঝরিয়েছে অশ্রুর ধারা -

'আবার বারএ মোর নয়নের পাণী।'

রাধা কৃষ্ণের কাছে আত্মনিবেদনের বিনন্দ্রতা -

'দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।।'

সমাজ সংসার তার কাছে আজ তুচ্ছ মনে হয়েছে। রাধার সুরে চিত্ত বিচলিত তাই -

'আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ সাকে দেলোঁ কানাসোআঁ পাণী।।'

এ রকম বিপর্যয় দেখে মনে হয় রাধা সম্পূর্ণ কৃষ্ণাভিমুখী। বড়াইর পরামর্শে রাধার কর্তৃক বাঁশি চুরি পর কৃষ্ণের কাকুতি মিনতি দেখে বাঁশি প্রত্যার্পন। বংশীখন্ডের অন্তিমে রাধা-র সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন - 'আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী।'

কৃষ্ণ চরিত্র ঃ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণ। জন্মখন্ডে মর্তে কৃষ্ণের আবির্ভাব সম্পর্কে জানানো হয়েছে। তাম্বুল থেকে গ্রাম্য রাখোয়াল জাতীয় চরিত্র কৃষ্ণ অতি সক্রিয়। সুন্দরী রাধার প্রতি তার কামলোলুপ দৃষ্টি দেখে লাপট্য জাতীয় পুরুষ চরিত্র বলে মনে হয়। রাধাকে সে ছলে বলে সম্ভোগ করেছে এবং বংশীখন্ডে রাধাকে বাঁশি ধ্বনিতে উন্মাদিনী করে তুলেছে। বংশীখন্ডে কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে রাধা সহ গোপ বালাদের লক্ষ্য করে নানা রকম রঙ্গরসিকতার সঙ্গে করতাল মৃদঙ্গ বাজিয়ে রাধাকে আকর্ষণের চেষ্টা করছে। তাতে কামনা হওয়ায় এক মোনহর সুবর্ণ বাঁশি নির্মাণ করে অলক্ষ্যে থেকে রাধাকে উতলা চঞ্চল করে তুলল।

বংশী খন্ডে কৃষ্ণ যেন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার কৌশল অবলম্বন করল। এখানে কৃষ্ণের ভূমিকার থেকে তার বাঁশিই প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। এখ রাধাই নারী হিসাবে তার প্রেমিক পুরুষের অন্বেষণ রত। রাধার মান অভিমান চাওয়া পাওয়া নিবেদন দেখে তাকে জীবন্ত নারী ছাড়া কিছুই ভাবা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণ সব দেখে এক বীতরাগী পুরুষের ছলনা নিয়েছে। তবে বড়াইর অনুরোধে কৃষ্ণের বংশীসহ কদম্বতলে উপস্থিত ও রাধার সঙ্গে মিলন। বংশী সর্বস্ব কৃষ্ণকে বড়াই নিন্দাউলী শস্ত্রে ঘুম পাড়িয়ে রাধাকে দিয়ে বাঁশি চুরির ঘটনা লক্ষ্য করি। ঘুম থেকে জেগে বাঁশি না পেয়ে - 'চারিপাশ চাহী বাঁশী না পায়িআঁ কাঢ়িনান্ত দীর্ঘ রাএ।।'

এ বনে শিশু সুলভ মনোভাব কৃষ্ণের মধ্যে লক্ষ্য করি। বাঁশি দিয়ে পারার জন্য মিনতি জানিয়েছে যা কৃষ্ণের মত পুরুষের শোভা পায় না। তার মখে গ্রাম্য বুলি – (নটকী, গোআলী, ছিনারী, পামরী) বেসানান। কৃষ্ণের পক্ষে রাধার সঙ্গে কলহ করা সাজেনা, তার পৌরুষ প্রশ্ন চিহ্নে মুখে এসে দাঁড়ায়। রাধা তার পায়ে দাসী হয়ে প্রাণ সমর্পণ করলেও কৃষ্ণ শুধু দোষ মার্জনা ও অহিত না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্ত থেকেছে। বংশীখন্ডে কৃষ্ণ চরিত্রের যে বিবর্তন ও বিরহের পথ প্রস্তুতি তা দেখা যায়।

বড়াই ঃ– সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি তিনটি চরিত্রকে অবলম্বন করে সাফল্যের শিখর স্পর্শ করেছে। রাধাকৃষ্ণের পাশাপাশি বড়াই চরিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বড়াই কখনো দূতী, অভিভাবক, কখনো প্রিয় বন্ধু। জীবনরসরসিক বড়াই – ছলনাময়ী, কপট, প্রগলভতা, স্নেহ ভালোবাসায় মেশানো চরিত্র। রাধার রক্ষনা বেক্ষনের জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিটি খন্ডের ঘটনার সঙ্গে তার সম্পর্ক গভীর ভাবে যুক্ত। তাম্বুল থেকে বিরহ পর্যন্ত রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছে। কখনো রাধার বিরাগভাজন হয়েছে আবার কখনো নির্ভরশীল বন্ধুতে পরিণত হয়েছে।

তাম্বুলখন্ড, দানখন্ডে কৃষ্ণের কাছে রাধাকে পৌছে দেবার সমস্ত পরিকল্পনা ও চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বাক্‌চতুর –

‘শেত চামর সম কেশ। কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে।
ভ্রুহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি। কোটর বাটুল দুই আখি।।’

বৃদ্ধা কুটনী জাতীয় রমনী ছাড়া অন্যদুটি চরিত্র যেন অচল। রাধা কৃষ্ণের চরিত্র দ্বয়ের সবলতার জন্য বড়াই অপরিহার্য। ‘বাণখন্ডে’ এসে বড়াই এর স্নেহ বাৎসল্য খুব বেশি করে দেখা দিয়েছে। পুষ্পবানে আহত রাধাকে দেখে যেমন স্নেহশীল তেমন কৃষ্ণের অহীত কর্মের জন্য পাওনা হয়েছে তিরস্কার। বংশীখন্ডে এসে বড়াই রাধার একান্ত সুখ দুঃখের সাথী হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের জন্য রাধার আকুলত বড়াইকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। রাধার কথা শুনে বড়াই –

‘যেত কিছু বুয়িলেঁ মোর পরাণ নাতিনী। বড় দুখ উপছিল মনে তাকে সুণী।।’

কৃষ্ণের জন্য রাধা প্রাণ ত্যাগের কথা জানালে বড়াই স্নেহশীলা নারীর মতো তাকে উপদেশ দিয়েছে এবং কৃষ্ণ এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বৃদ্ধা অসমর্থ শরীর নিয়ে কৃষ্ণ অন্বেষণে রত এবং উভয়ের সাক্ষাত ঘটাতে পালন করেছে বিশেষ ভূমিকা।

বংশী উভয়ের সাক্ষাত ঘটানোর পর রাধার সঙ্গে পরামর্শ করে কৃষ্ণকে ‘নিন্দাউলি’ মন্ত্রে ঘুম পাড়ানো এবং বাঁশি চুরির ঘটনায বড়ায়ের কথামত রাধা কৃষ্ণের মোহন বাঁশি কলসীর ভিতর লুকিয়ে ফেলল। নিদ্রা ভাঙলে কৃষ্ণ তার বাঁশি খুঁজে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে, তখন প্রিয় নাতির জন্য তার স্নেহ জেগে ওঠে এবং বাঁশি দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দান। শেষ পর্যন্ত বড়াই রাধা ও কৃষ্ণের মিলন সাধনে মূল ভূমিকাটি পালন করেছে। চরিত্রটি প্রতিটি খন্ডে দুই চরিত্রকে সচল ও সংযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করেছে।

টিপ্পনী

আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন ঃ-

ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গীতগোবিন্দের যে প্রভাব পড়েছে তা লেখ।

খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের নাটকীয়তা ও গীতিবর্ণ আলোচনা কর।

গ) বংশীখন্ড অবলম্বে রাধা চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

টিপ্পনী

২.১.১০. রাধা বিরহ ঃ

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে উন্মাদিনী রাধার কৃষ্ণ অদর্শন জনিত হাহাকার বিরহ পর্যায়ে এসে তীব্রতর হয়েছে। কৃষ্ণ আজ কর্তব্য পালনার্থে মথুরা নগরীতে, অন্যদিকে রাধার প্রাণ ও জীবগত বিরহ বোধে। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের এমন আচরণের জন্য ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। দূতী বড়াই এখানে তার এক মাত্র অবলম্বন প্রাণের দোসর। মাসের পর মাস অতিবাহিত হচ্ছে অথচ কৃষ্ণ ফিরে আসছে না এমন হতাশ ব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে রাধার প্রাণ ধারণ অসম্ভব হয়ে উঠছে। কদম্বতলে কৃষ্ণ তনুতে নিশ্চিন্তে ঘুমের মাঝে কৃষ্ণ না বলে মথুরা গমন করেছে। নিদ্রাভঙ্গে সেই রাধাই বিরহ সমুদ্রে নিজহিতা।

২.১.১১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ কি প্রক্ষিপ্ত?

সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অন্তিম অংশ 'রাধাবিরহ' এই অংশটি নিয়ে একটি প্রশ্ন উঠে আসে তা হল 'রাধাবিরহ' কি প্রক্ষিপ্ত? সমগ্র কাব্যের প্রতিটি অংশে বা অধ্যায়ে 'খন্ড' শব্দটি যুক্ত কিন্তু রাধাবিরহে এসে 'খন্ড' শব্দটি বিযুক্ত। তাই এত প্রশ্ন চিহ্ন। এছাড়াও আরো কয়েকটি দিক নিয়েও প্রশ্ন আছে যা আলোচনা করা হবে এই অংশে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাধাবিরহ' প্রক্ষিপ্ত কি না সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। সমালোচকগণ মনে করেন -

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাধাবিরহ' ছাড়া বাকি ১২টি অধ্যায়ে 'খন্ড' শব্দটি যুক্ত। রাধাবিরহের ক্ষেত্রে 'খন্ড' শব্দটি যুক্ত হয় নি তাই এটি 'স্বতন্ত্রকাব্য'।

বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন - 'সে বড়াই প্রথম হইতে রাধা কৃষ্ণের মিলনে দূতীগিরি করিতে ছিলেন, এ বড়াই যেন সে বড়াই নয়। এ বড়াই কৃষ্ণ 'কিবা রূপ ধরে', তাথা জানেন না। স্বভাব-চরিত্রেরও দেখি এ বড়াই রাধার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশালিনী পূর্বখন্ডে তিনি কৃষ্ণের কুট্টিনী মাত্র।'

রাধা কৃষ্ণের মিলন সম্পর্কে বলা হয়েছে - 'রাধাবিরহে'র পূর্বে একাধিক বার রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটেছে কিন্তু 'রাধাবিরহে'র বিরহের চিত্র দেখলে তা মনে হয় না।

ভাষার ক্ষেত্রে অনেকে মনে করেন পূর্বখন্ড গুলি থেকে বিরহের ভাষা আধুনিক! বিমান বিহারী বাবু দেখিয়েছেন - 'ইহাতে 'রাধিকা কাহ্নঞিঁর সঙ্গে আছে'র মতন আধুনিক ভাষাও

পাওয়া যায়।'

'নবলক্ষকড়ী' ও শতপল 'সোনা' নিয়েও বিতর্ক বর্তমান। এছাড়া ভনিতা অংশ নিয়েও বিতর্কের ঝড় উঠেছে। ভনিতাগুলি–

গাইল বড়ু চন্ডীদাস বাসলী বরেল।
বাসালী শিরে বন্দী চন্ডীদাস গাএ।
গাইল চন্ডীদাসে।
গাইল বড়ু চন্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী চরণে। ইত্যাদি

টিপ্পনী

এ সকল ক্ষেত্রে কোন অবান্তর বিষয় চোখে পড়ে না। বানান, শব্দ লিপিকরদের হাতে পরিবর্তিত বা ছোড়া যেতে পারে তার কারণে প্রক্ষিতপ্ত বলা সঙ্খত নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথিতে 'কালীয়দমন খন্ডে'র পরবর্তী খন্ডটির নাম ছেড়ে গেছে। বসন্তরঞ্জন রায় এই খন্ডের নামকরণ করলেন – 'যমুনাখন্ড'। রাধা বিষয়ের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি বা লিপিকরদের হাতে ছাড়ে যেতে পারে। 'রাধাবিরহের' পূর্বে ত্রয়ী চরিত্রের কথোপকথনে শুনে মনে হয় যে তাদের (রাধা–কৃষ্ণের) মিলন ঘটেছে। রাধাবিরহের অনেকস্থানে তার প্রসঙ্গ বর্তমান। স্বপ্নস্মৃতি সেদুর পথে তার এক আলেখ্য –

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী।
সব কথা কহি আরোঁ তোষারে হে।।

এ ছাড়া প্রতিটি খন্ডের শুরুতে পূর্ববর্তী খন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাসূচক প্রসঙ্গ দেখা যায়। রাধা বিরহে কৃষ্ণের সঙ্গে –

বসিআঁ কদম্বতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চম্বিল বদন আন্ধারে হে।

এছাড়া অন্যান্য খন্ডেরও পূর্বকর্মের ঘটনা থেকে বোঝা যায় একটা পরম্পরা যুক্ত 'বিরহ' অংশটি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা অন্যান্য খন্ড গুলির মতোই। এই খন্ডটির ভাষা আধুনিক প্রযুক্তি সঠিক নয়। ভনিতার ক্ষেত্রে যে আটটি উল্লেখ আছে তার মধ্যে (৫) পাঁচিটি উল্লেখ অন্যান্য খন্ডে দেখা যায়। রাধাবিরহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চরিত্র, ভনিতা, ভাব, ভাষা, রাগ–রাগিনী সংস্কৃত শ্লোক, ছন্দ 'ধ্রুবপদ' সব কিছু বিচার করে 'রাধাবিরহ'কে প্রক্ষিপ্ত বলে পৃথক করা অসম্ভব।

২.১.১২. রাধাবিরহের গীতিমূর্চ্ছনা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাগ–রাগিনী তীল – লয় – কথোপকথন দেখে নাট্য ও গীতি প্রবণ কাব্য ছাড়া অন্যকিছুই ভাবা যায় না। অন্যান্য খন্ড গুলিতে বাক্‌চাতুর্য আখ্যান ধর্মীতা ও নাট্যকীয়তা বেশি করে ফুটেছে। বংশীখন্ডে এসে সংলাপ থাকলেও সংগীতের প্রাধান্য এবং আধুনিক গীতি কবিতা সুর ধ্বনিত। 'রাধাবিরহে' এসে রাধার বিচ্ছেদ বেদনার করুণ রাগিনী গীতিকাব্যময় হয়ে উঠেছে। বেদনদীর্ন বাধার ব্যক্তিগত অহুভূতিকে চন্ডীদাস সর্বজনীন বেদনায় রূপদান

করেছেন।

রাধা বিরহের শুরুতেই স্বপ্ন কল্পনার সঙ্গে রোম্যান্টিক কাব্যিক মেজাজে সৃষ্টি করলেন অপূর্ব কাব্য সুষমা –

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহি আরোঁ তোক্ষারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আক্ষার হে।।

টিপ্পনী

প্রেমিক পুরুষ ছাড়া রাধার জীবন যৌবন যে ব্যর্থ তা যন্ত্রনাকাতর গ্রহণ হৃদয়ের কথা, – ৩৫৪ নং পদে –

'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার। ছিন্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ যে সিসের সিন্দুর। বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।।'

চন্ডীদাস কত উচ্চকোটির গীতি কবি, তা কৃষ্ণ বিরহিনী নায়িকা রাধার হৃদয় কথাকে গৈরিক বেশ পরালেন –

মুন্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনী রূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।।

বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক 'পদ' সৃষ্টি করলেন বড়ু চন্ডীদাস।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা 'রাধাবিরহ' অংশ প্রকৃতির পর্নেভূমিতে স্থাপন করে রাধার বিচ্ছেদ কাতরতাকে গভীর করে তুলেছেন। কৃষ্ণের কথা ভেবে ভেবে রাধার নানস্ত্র ঝরে পড়ে –

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ করিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী।।

বিরহিনী রাধা কৃষ্ণের জন্য পথ চেয়ে চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার চলার শক্তি আজি নিশেষিত। বিরহ সন্তপ্তা রাধার কাম্যলোক শুধু কৃষ্ণ, অন্যসকল তুচ্ছ মনে হয়েছে। চতুর্মাসী বর্ণনায় গীতিময় পদটি –

'ভাদর মাঁসে অহোনিশি আন্দাকারে। শিখ ভেক ডাহুক করে কোলাহলে।।
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ। চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক।।
আশ্বিন মাসের শেষ নিবড়ে বারিচী। মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী।।
তথেঁ কাহ্ন বিনী হৈব নিফল জীবন।'

রাধার হৃদয় বেদনা যে ভাবে পদ গুলিতে ব্যক্ত হয়েছে তা উচ্চ শ্রেণীর গীতি কথিতা বলেই মনে হয়।

২.১.১৩. চরিত্র বিশ্লেষণ ঃ

রাধা ঃ– বংশীখন্ডে রাধার যে ব্যাকুলতা মিলনাকাঙ্খা তার বিরহ পর্যায়ে এসে দু নয়নে

স্রাবণ ঘনিয়েছে। 'রাধাবিরহে' - কৃষ্ণ মথুরা গমন করেছে বড়াইর কাছে রাধা রিক্ত ইন্দয়ের যন্ত্রনা ব্যক্ত করেছে। বসন্তের পটভূমিতে যৌবনা বাধার প্রিয় দূরদেশে গেলে 'পাঁজর ঝাঁঝর' তে হতে বাধ্য। একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে যন্ত্রনা দীর্ন রাধা হৃদয়। এ বৈপরীত্য রাধা বিরহের কাব্যপ্রাণ। হৃদয় রাজ্যে যেমন তেমন প্রকৃতি রাজ্যে আলোড়ন চন্ডীদাসের বিরহের পদে -

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
যে দিগেঁ কি বসন্ত না জানী।। আল।।

কৃষ্ণকে না দেখে রাধা হৃদয় কুমোরের পোয়ানের মত নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে। তাই বার বার বৃদ্ধ সহচারী, প্রাণের বড়াইকে কৃষ্ণের সন্ধান নিয়ে আসার জন্য কাতর অনুরোধ জানায়।

কৃষ্ণবিবনে পঞ্চশরাতুরা রাধিকা শরণে, জাগরণে কৃষ্ণ কথাই মনে পড়ে -

'সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন চিত্তে না পড়এ আন
তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে।।'

রাধাবিবরহে এসে কৃষ্ণের প্রেম কেমন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেন-

'রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেমে ভাষা পড়েছে কিন্তু রাধা এখন কৃষ্ণের প্রেমে আত্ম হারা। গোকুল ত্যাগ করার সঙ্কল্প করে কৃষ্ণ রাধাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিল।'

রাধিকা বিগত দিনের কর্তব্য কর্মের কথা ভেবে বড়াইর কাছে আক্ষেপ করেছে। কৃষ্ণ ছাড়া তার জীবন অন্ধকারময় - 'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার।' পদটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কৃষ্ণকে এখন আর কাছে পাওয়া যাচ্ছে না, এ দিকে রাধা বিরহে 'ঘিনী', - বড়াই কৃষ্ণ অন্তর সম্পর্কে জানাল -

'কাল কাহ্নাঞিঁ কঠিন তার আন্তর ল।
বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর খানে।।'

রাধিকা মদন শরে আহত তার একমাত্র কামনা কৃষ্ণসঙ্গ। কাসুর বিরহ সন্তাপ যে বেদনা দায়ক তা -

'সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারি।
তোর বিরহ সন্তাপ সহিতেঁ না পারি।।'

রাধা কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনার মিনতি জানায় বড়ুইর কাছে -

বড়ায়িগো
কাহ্নের বিরহ ভারে জিয়ন্তে মরিলোঁ ল।
আনি দেহ শ্রী মধুসূদনে।। ল।।

রাধা কতটা কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনা তা বোঝাতে চতুর্মাসী বর্ণনার অবতারনা। সেখানে বিরহ বর্ণনায় রাধার অন্তরের বেদনা ঝরে পড়েছে অশ্রু হয়ে। বিরহিনী রাধা পুরুষ জাতির এ রকম আচরণে ক্ষোভের বহির প্রকাশ -

'বিষম পুরুষ জাতী কপট পুরিত মতী

টিপ্পনী

নানা বোলে সে তিরিক রঞ্জে।'

বড়ু চন্ডীদাস কাব্য শেষের পূর্বে ক্ষণ মিলনের পরে বিচ্ছেদ সংঘটিত করেছেন। যার কারণে বিরহের মনস্তদ হাহাকার অধিক ফুটেছে। এতে রাধা চরিত্রের মর্ম বেদনা ও গভীর দুঃখবোধ কাব্যে অন্তিমে মুখ্য হয়ে উঠেছে। রাধা চরিত্র সম্পর্কে সুকুমার সেন জানালেন –

'তাহার মধ্যে রাধা চরিত্রের বিকাশে ও পরিণতিতে কবি যে দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয় রহিত।'

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পৃ – ১৪৮)

টিপ্পনী

কৃষ্ণচরিত্র ঃ–

শ্রী কৃষ্ণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত' কাব্যের নায়ক চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করে ঘটনার উত্থান পতন, রাধিকার মান–অভিমান, হাসিকান্না, দুঃখ বেদনার বহিঃপ্রকাশ। শুরুতেই কৃষ্ণকে এক গ্রাম্য রাখাল বালক বলে মনে হয়। অপরিণামদর্শী গ্রাম্য যুবকের মত রূপজমোহ, কামলালসার বসবর্তী। অসংযমী ছলে বলে বালিকা রাধাকে পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব। 'তাম্বুল' থেকে 'বৃন্দাবনখন্ড' পর্যন্ত রাধা কামনায় সদা ব্যস্ত 'বংশীখন্ডে' এসে চরিত্রজাত পরিবর্তন দেখা যায়।

অলক্ষ্যে থেকে বাঁশির ধ্বনিতে রাধাকে করেছে পাগলিনী। রাধার ব্যক্তি, পারিবারিক ও গৃহজীবন আজ বিপর্যস্ত। কৃষ্ণ যেন নিজের আত্মগোপনের পথ প্রস্তুত করছে। কৃষ্ণ জানিয়েছে সে কর্তব্য পালনার্থে মথুরায় গমন আবশ্যক। কিন্তু তা রাধাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে যাওয়াটা কৃষ্ণের পক্ষে ঠিক হয়নি। এই মথুরা গমনই রাধিকার জীবনে বিরহের হাহাকার এনেছে। কৃষ্ণ এখন রাধার যৌবনকে 'ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোক্ষার যৌবন।' মনে করে। রাধার বেদানা, হাহাকার আত্ম নিবেদন তার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মধ্যযুগীয় ভোগ সর্বস্ব পুরুষ তান্ত্রিক মনোভঙ্গি দেখতে পাই, এ সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন – 'তাহার মধ্যে স্থূল দাম্ভিকতা, দেহ লোলুপ রিরংসা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের কুটিল ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন সদ্‌গুণ বা কোমলতার মানবীয় প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।'

তবে ঠিক সর্বদা একথা সঠিক নয় কারণ কৃষ্ণ কোন কোন সময় তার কর্তব্য বোধ কাজে লাগিয়েছে। মথুরা যাত্রার পূর্বে কৃষ্ণ বড়াইকে রাধার ক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে জানিয়েছে –

'তাকে রাখিহ যতনে আপন আন্তরে।
জাইব আক্ষে মথুরা নগরে।।'

তার মথুরা গমন কালে রাধা জেগে থাকলে মিনতি ও অশ্রুপ্লাবন তার পথ রুদ্ধ করতে পারে ভেবে এ পথ অবলম্বন করেছে। যাই হোক না কেন যতই কর্তব্যের কারনে মথুরা গমন হোক না কেন মানুষ হিসাবে রাধার প্রতি তার কর্তব্যবোধ থেকেই যায়।

রাধা বিরহে গততৃষ্ণকৃষ্ণ ঃ–

বড়ু চন্ডীদাস রাধা বিরহে এসে কৃষ্ণকে 'গততৃষ্ণকৃষ্ণ' রূপে অঙ্কন করেছেন। কৃষ্ণের এই গত তৃষ্ণার কারণে রাধার বিরহ বেদনা। রাধা বিরহে কৃষ্ণ পাগলিনী রাধার হৃদয় হাহাকারের

কোন মূল্য দোনি কৃষ্ণ।এতদিন যে কৃষ্ণ রাধার জন্য সতৃষ্ণ সেই কৃষ্ণই রাধাবিরহে এসে গততৃষ্ণ। সত্যিই কি প্রেমিক কৃষ্ণ আজ রাধা বিমুখ না অন্যকিছু গূঢ়তর। ঘটনা নিহিত আছে এর মধ্যে।

যে কৃষ্ণ 'তাম্বুল খন্ডে' রাধা রূপে বিভোর। 'দানখন্ডে' দেহ সম্ভোগের পর রাধাকে পাওয়ার জন্য নানা রকম ছলনা ও চাতুর্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বড়াই বুড়ির সহায়তায় রাধার সঙ্গে মিলন হয়েছে সম্ভব। ধীরে ধীরে রাধাকে কুলত্যাগী ও কৃষ্ণ কলঙ্কিনীতে পরিণত করে পূরণ করেছে নিজের মনো ইচ্ছা। বীতরাগী কৃষ্ণের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি লিখলেন –

'অধুনাপি কিম্মু সদয়ং হৃদয়ে পুরুষে হন্য রমণী করণে।
গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে সুতনস্তানাতি সদনং কদনং।।'

পূর্বাপয় খন্ডগুলি আলোচনা করে রীতরাগের কয়েকটি কারণ অনুসন্ধান করা যায় মাত্র। যেমন –

তাম্বুলখন্ডে কৃষ্ণের পান-কর্পুর পদদলিত করা, ও বড়াইকে চপেটঘাত প্রস্তুতি ঘটনা।

ভারখন্ডে – স্বয়ং নারায়ন কৃষ্ণকে দিয়ে ভার হেন করানো।

হারখন্ডে – রাধা যশোদার কাছে হার চুরির নালিশ। রাধা সহ অন্যান্য গোপীদের কাছে কর জোড়ে প্রার্থনা তার আগুয়ে কি আঘাত হেনেছে? এরকম প্রশ্ন উঠে আসে।

পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কৃষ্ণ প্রথম থেকে নারী লোলুপ ও বহুগাণী তার পরিচয় পাচ্ছি এই বহু সম্ভোগ কি তাকে শেষ পর্যন্ত রাধা বিমুখ করে তুলেছে। বিরহ পর্যায়ে এসে রাধার রূপ যৌবন তাকে আর আকর্ষণ করে না, তাই রাধাকে বলে –

'পোটলী বান্ধিএঁা বাঘ নহুলী যৌবন।'

যে প্রশ্ন রাধা কৃষ্ণকে বলে তার কাছ থেকে বিস্তার পাবার চেষ্টা করত সেই 'মামী' 'ভাগিনী' সম্পর্ক তুলে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছে। এছাড়া কংস বিনাশের জন্য তার জন্ম সে কর্তব্য যেমন আছে, তেমনি কৃষ্ণ যোগ সাধনার কথাও জানিয়েছে –

'আহোনিশি যোগ ধেআই
মন পবন গগনে রহাই।।'

কৃষ্ণ মদনবানকে ছিন্ন করেছে যোগ ধ্যানে মগ্ন কারণ কংস বিনাশ সাধন করতে হবে। এ যেন ভোগের পথ দিয়ে ত্যাগের তীর্থে উপনীত হওয়া।

আমরা যদি গততৃষ্ণকৃষ্ণের বিষয়টি একটু অন্য রকম চোখে দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখবো – কৃষ্ণ ভোগ সর্বস্ব পুরুষের প্রতিনিধি, আদি-মধ্যযুগের একজন কবি প্রেম-যৌবন এবং নর-নারীর মনস্তত্ত্বের গোপন দিকটি তুলে ধরেছেন। তাম্বুল থেকে বৃন্দাবনখন্ড পর্যন্ত নারীদেহ ভোগের পরম ইচ্ছা কৃষ্ণের মধ্যে বিদ্যমান। রাধা তখন প্রবল ভাবে কৃষ্ণ বিমুখ। ভোগ সর্বস্ব কৃষ্ণ বহু সম্ভোগের পর বৃন্দাবন খন্ডে পূর্ণমিলন সম্ভব হয়েছে। বৃন্দাবন খন্ড থেকে একটু একটু করে কৃষ্ণ সরে এসেছে অন্যদিকে রাধা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য প্রবল আকর্ষণ বোধ করেছে। সম্ভোগ শেষে তার বীতয়াগ জন্মেছে যার কারণে সে রাধার কাছ থেকে বার বার নিজেকে সরীয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন সময় যোগ ধ্যান, কংসবিনাশ প্রভৃতির প্রসঙ্গ অবতারনা করে নিজেকে আড়াল করতে সচেষ্ট। তাই রাধার হৃদয় বেদনা, চোখের জলের কোন মূল্য দেয় নি।

টিপ্পনী

বড়াই চরিত্র ঃ-

টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বড়াই। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের 'কুট্টিনী' জাতীয় রমনীর আদলে গড়েছেন বড়ু চন্ডীদাস। সমগ্র কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের সংযোগ সূত্র গ্রন্থনে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। জন্মখন্ডেই বড়াইর পরিচয় পাচ্ছি, তার পর রাধার সর্বপণের দেখভালের দায়িত্বে থাকা অতন্দ্রপ্রহরী। দিনে দিনে রাধার সঙ্গে সখ্যতা ও সুখ দুঃখের সাথী প্রাণের দোসর। বংশীখন্ডে বিরহিনী রাধার প্রেরণা ও সান্ত্বনাদাত্রী। কৃষ্ণের সঙ্গে তার মিলন ঘটানোর একমাত্র মাধ্যম বড়াই।

বংশীখন্ডে ও বিরহে রাধার প্রতি বড়াইর স্নেহশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার বিরহ বোধ বড়াই আপন অন্তরে অনুভব করে কৃষ্ণকে ধিক্কার দিতে কার্পণ্য করেনি। বড়াই যা কিছু করেছে তা নাতি কৃষ্ণ ও প্রাণের নাতিনী রাধার জন্য তাদের প্রেমপূর্ণ জীবন দেখে সুখস্মৃতি অনুভব করেছে। রাধাবিরহে এসে যে কুট্টিনী জাতীয় চারিত্রের কথা বলা হচ্ছে তা দেখা যাচ্ছে না, বড়াই স্নেহশীল মানবিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। প্রেম-প্রীতি অভিজ্ঞা বড়াই কৃষ্ণকে পরামর্শ দান করে শিখিয়েছে কিভাবে নারী হৃদয় জয় করতে হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে তাকে চলতে হয়েছে। শুধু প্রেমিক কৃষ্ণ বা রাধিকা নয় আইন গৃহের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সে তার উদ্দেশ্য সাধন করেছে।

'রাধা বিরহ' অংশে রাধার সুখ দুঃখের সঙ্গে বড়াইর সহানুভূতি দেখবার মতো। অভিজ্ঞা বড়াই সকল কিছুই বোঝেন তাই গত তৃষ্ণকৃষ্ণকে রাধার কাছে উপস্থিত করার জন্য যার পর নাই তৎপরতা দেখা যায়। 'খিনী' রাধার বারংবার -

'আল পরাণের বড়ায়ি। কাহ্নঞিঁ মোকে আণিআঁ দে।।'

এ কথা তাকে উতলা করে ছেড়েছে। শেষ পর্যন্ত বড়াইর তৎপরতার তাদের মিলন সম্ভব হল। কৃষ্ণ কংস নিধনে মথুরা গমন করলে দূতী বড়াইকে রাধার সমস্ত দেখভালের দায়িত্ব অর্পণ করল। অভিজ্ঞা বড়াই 'বিষম পুরুষ' জাতির এ হেন 'গত তৃষ্ণ' অবস্থার জন্য অনুশোনো করেছে। 'কাল' রূপের সঙ্গে চরিত্র বর্ণনায় বলেছে -

'কাল কাহ্নাঞিঁ কঠিন তার আন্তরল, বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর যানে।।
তোক্ষার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ বোল বৃন্দাবনে।।
নিবারিআঁ যাক নিজ মনে।'

বড়াই কৃষ্ণের আচরণে বিস্মিত কারণ যে কৃষ্ণ এতদিন রাধার জন্য তাকে কত কিছু করিয়েছে আজ সেই কৃষ্ণ বলছে -

'শাকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোক্ষারে।
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুণী তারে।।'

নারী হয়ে নারীর এমন অবমাননা সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই কৃষ্ণ নয় পুরুষ সম্পর্কে তার উক্তি-

'বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোক্ষার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোক্ষে সে আমৃত।।'

রাধা বিরহে বড়াই সত্য প্রকাশে কৃষ্ণের চরিত্রের হীনতাকে সে ধিক্কার দিয়েছে। বাচাল, প্রগলভা, বড়াই আজ সচেতন আভজ্ঞা রমণী রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত।

আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন ঃ-

ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা বিরহ অংশটি কি প্রক্ষিত? আলোচনা কর।

খ) 'রাধাবিরহ' অংশের গীতিপ্রবণতা সম্পর্কে তোমার মন্তব্য জ্ঞাপন কর।

গ) বিরহিনী রাধার পরিচয় দাও।

ঘ) 'গততৃষ্ণকৃষ্ণ' - চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

টিপ্পনী

২.১.১৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলীর রাধা ঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলী উভয় সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করা হয়েছে। দুটি সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও তাদের মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেও ভাষা ও রসের ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। বড়ু চন্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণকে কামনা বাসনা যুক্ত নায়ক চরিত্র গড়ে কাব্যকে করেছেন আদিরসাত্মক। অপর দিকে পদাবলী সংহত, নির্মল, স্বল্পায়তন এক গীতিকবিতা, যার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণে মহাপ্রেমকে ফুটিয়ে তোলার সাধনা।

পদাবলী সাহিত্য চিরন্তন মানব-মানবীর হৃদয়ে আবেদন রাখে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পৌরাণিক বিষয় থাকলেও তত্ত্বগত দিকটি তেমন প্রভাব ফেলেনি। কাব্যটি ভোগ সর্বস্ব আদি রসাত্মক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বৈষ্ণবপদাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে ও মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য -

'বৈষ্ণবপদাবলীর মতো ব্যপ্তি ও শতধা বিস্তার ও তার নেই। এই না থাকার কারণটি ও স্পষ্ট। তাহলো, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এক জন কবির রচিত নির্দিষ্ট একটি আখ্যান কাব্য। আর বৈষ্ণবপদাবলী কয়েক শতাব্দী ব্যাপী অনেক কবি বা পদকর্তা রচিত বহুপদের সমষ্টি, তাই তা পদাবলী।' (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পরিক্রমা)

পদাবলী সাহিত্যের যে মাধুর্যভাব তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে ঐশ্বর্যভাবের বর্ণনা যেমন -

১) আক্ষে দেব সংসারের উপর।

২) স্বর্গে মর্ত্যেপাতালে আক্ষার এক কায়া।

৩) আক্ষে হরী আক্ষে হর আক্ষে সহাযোগী।

বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে ঐশ্বর্যভাব দেখা যায় না। প্রেমিক পুরুষ রাধার প্রেমে মগ্ন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপ যৌবনের কথা শুনে কাম লোপ্পুপ। বড়ু চন্ডীদাস লিখলেন -

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুণী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী।। বড়ায়িল।।

এখানে পদাবলীর নির্মল কোমলকান্ত পদাবলীর কোন ছোয়া নেই তা দেহ কামনায় তপ্ত। পদাবলী সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখবো চন্ডীদাসের কুল-শীল-মান ত্যাগী রাধিকা -

সদাই ধেআনে চাহে মেঘ পানে
নাচলে নয়ান তারা।

এখানে কামগন্ধহীন এক অনির্বচনীয় জগৎ আমাদের সামনে প্রতিভাত।এ 'পিরীতি' জগতে দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'বংশী' এবং 'রাধাবিরহে' রাধার মর্মশীল হাহাকার বৈষ্ণব পদাবলীর সাধিকা রাধার কথা স্মরণ করায়। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যপতির কিছু পদের সঙ্গে মিল দেখা যায়।

টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের - 'শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে

সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।'

বিদ্যাপতির পদ - 'এ ভরা বাদর মাহভাদর

শূন্য মন্দির মোর।'

বৈষ্ণবপদাবলীর - 'সব সমর্পিয়া একমন হইয়া

নিশ্চয় হইলাম দাসী।।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দেখা যায় - 'দাসী হঞা তার পাত্র নিশিবোঁ আপনা।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার হৃদয় দহণ যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেখানে পদাবলীর মত সর্বজনীন সুর ঝরে পড়েছে। কানুর বাঁশি কেশ ধরে নিয়ে যায় - তেমনি বড়ু চন্ডীদাসের রাধা আকুল হয়ে ওঠে কৃষ্ণের বাঁশিতে -

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।

চন্ডীদাসের যোগিনী রূপী রাধার ছায়াপদে লক্ষ্য করা যায় কৃষ্ণবিহনে কৃষ্ণউন্মাদিনী রাধার আকুতির মধ্যে -

মন্ডিআঁ পেলাইবো কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনী রূপ ধরী লাইবোঁ দেশন্তর।।

বংশীখন্ডের একটি পদে পদাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সংযোগ লক্ষিত হয়। পদাবলীতে -

'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।'
কানের ভিতর দিয়া মরসে পশিলি গো।
আকুল করিল মোর প্রাণ।

একই আকুলতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে -

'বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হারআঁ
কাহ্ন গেলা কোন দিশে।
তা বিনি সকল আন্তর দহে

যেন বোআপিল বিষে।।'

পদাবলীর ভাবতন্ময় রাধিকাকে আমরা যে রূপে পাচ্ছি তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধারই বিবর্তিত পরিশীলিত রূপ। এ সম্পর্কে প্রথম নাথ বিশী মন্তব্য করেছেন -

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রাধার যেখানে শেষ, পদাবলীর রাধার সেখানে আরম্ভ।শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরও পদাবলীর রাধাকে যথাক্রমে বৈষ্ণব কাব্যের পূর্ণ-রাধা ও উত্তর-রাধা বলা চলিতে পারে।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তিমে যে রাধাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তা বৈষ্ণব কাব্যের পূর্ব-রাধা। এ রাধাই সাধিকা ভাব তন্ময় পদাবলীর রাধিকা।

টিপ্পনী

আদর্শ প্রশ্নমালা ঃ

১) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এর কাব্যমূল্য বিচার কর।

২) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের আবিষ্কারের ইতিহাস ও নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩) 'বংশীখন্ড' অবলম্বনে বড়ু চন্ডীদাসের সমাজ সচেতনার পরিচয় দান কর।

৪) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের 'বংশীখন্ডে' আখ্যান, নাট্য ও গীতিধর্মিতার যে সমন্বয় ঘটেছে তা বর্ণনা কর।

৫) 'বংশীখন্ড' অবলম্বনে বংশী ব্যাকুলা রাধার পরিচয় দাও।

৬) 'বংশীখন্ড' অবলম্বনে কৃষ্ণ চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৭) 'রাধা বিরহে'র গততৃষ্ণ কৃষ্ণের স্বরূপটি আলোচনা কর।

৮) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াই চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

৯) 'রাধাবিরহে'র বিরহিনী রাধার পরিচয় দাও।

১০)'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে 'রাধাবিরহ' অংশ কি প্রক্ষিপ্ত? আলোচনা কর।

টিপ্পনী

তৃতীয় একক

শ্রীকৃষ্ণবিজয় : মালাধর বসু

৩.১.১ ভাগবতের সাধারণ পরিচয়

৩.১.২ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় : মালাধর বসু

৩.১.৩ কাব্যরচনা কাল

৩.১.৪ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : নামকরণ

৩.১.৫ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : কাহিনী

৩.১.৬ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : শ্রেণীবিচার

৩.১.৭ কবিকৃতিত্ব

৩.১.৮ ভাগবতের জনপ্রিয়তার অভাব

৩.১.৯ সহায়ক গ্রন্থাবলী

টিপ্পনী

৩.১. ১ ভাগবতের সাধারণ পরিচয়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দু'টি ধ্রুপদী মহাকাব্য (রামায়ণ ও মহাভারত) এবং একটি পুরানের (ভাগবত) বাংলা অনুবাদ হয়। ভাগবত পুরানের বাংলা অনুবাদ করেন মালাধর বসু (গুনরাজ খান)। এই অনুবাদ গ্রন্থটি একাধিক নামে পরিচিত - 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'গোবিন্দবিজয়','গোবিন্দমঙ্গল' এবং 'শ্রীকৃষ্ণবিক্রম'। এই কাব্যটি আলোচনার সূত্রে ভাগবত পুরাণ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। আরও আগে জানা দরকার পুরাণ সম্পর্কে। পুরাণ হ'ল এক বিশেষ ধরণের গ্রন্থ। বহু প্রাচীন যুগের প্রাচীন কাহিনী যার অবলম্বন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

"অনুমান খ্রীঃ পূর্ব ৪র্থ শতক হইতে সংস্কৃত ভাষায় একপ্রকার কাহিনীকেন্দ্রিক ধর্মগ্রন্থ প্রচারিত হয়, সাধারণতঃ তাহা পুরাণ নামে অভিহিত। পুরাণ একাধারে ইতিহাস, কাহিনী, দর্শন ও কাব্য।"

পুরাণের আভিধানিক অর্থ হল প্রাচীন, অনাদি, পুরাকালীন। এর পাঁচটি প্রধান লক্ষন - (ক) সর্গ (সৃষ্টি), (খ) প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নবসৃষ্টি), (গ) বংশ (দেবনতা ও ঋষিগণের বংশ বর্ণনা), (ঘ). মন্বন্তর (চৌদ্দজন মনুর শাসন বিবরণ), এবং (ঙ). বংশানুচরিত (পৌরানিক রাজাদের আখ্যায়িকা)। পুরাণে ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে।পুরাণ আঠারোটি। এদের মহাপুরাণও বলাহয়। এছাড়া আছে উপপুরাণ। এর সংখ্যাও আঠারোটি। আঠারোটি মহাপুরান যথাক্রমে -

১. ব্রহ্মপুরান ২. পদ্মপুরান ৩. বিষ্ণুপুরাণ

৪. শিবপুরান ৫. ভাগবত ৬. নারদীয়পুরাণ

টিপ্পনী

৭. লিঙ্গপুরান ৮. মার্কেন্ডেয় পুরান ৯. অগ্নিপুরান

১০. ভবিষ্যপুরান ১১. ব্রহ্মবৈবর্তপুরান ১২. বরাহপুরাণ

১৩. স্কন্দপুরাণ ১৪. বামনপুরাণ ১৫. কূর্মপুরাণ

১৬. মৎস্যপুরাণ ১৭. গরুড়পুরাণ ১৮. ব্রহ্মান্ডপুরাণ

আঠারোটি উপপুরান হ'ল যথাক্রমে-

১. আদিপুরাণ	২. নৃসিংহপুরাণ	৩. বায়ুপুরাণ
৪. শিবধর্ম পুরাণ	৫. দুর্বাসাপুরাণ	৬. নারদপুরাণ
৭. নন্দিকেশ্বরপুরাণ	৮. উশনঃপুরাণ	৯. কপিলাপুরাণ
১০. বরুণপুরাণ	১১. শাশ্বপুরাণ	১২. কালিকাপুরাণ
১৩. মহেশ্বরপুরাণ	১৪. পদ্মপুরাণ	১৫. দেবপুরাণ
১৬. পরাশর পুরান	১৭. গরুড় পুরাণ	১৮. ব্রহ্মান্ড পুরাণ

এবারে প্রত্যেকটি পুরাণের বিষয় সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

১. ব্রহ্মপুরাণ -এখানে দেবতা-অসুরদের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্র সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বোপরি কৃষ্ণের আখ্যান বর্ণিত। ব্রহ্মপুআণ দুটি পর্বে বিভক্ত - পূর্ব ও উত্তর।

২. পদ্ম পরুরান - পদ্মপুরান সৃষ্টি, ভূমি, স্বর্গ, পাতাল ও উত্তর - এই পাঁচটি খন্ডে বিভক্ত। সমগ্র পুরাণে এই পৃথিবির উৎপত্তি, তার পরিচয়, ধর্মতত্ত্ব, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞেরকাহিনী এছাড়া নানা কাহিনী বর্ণিত।

৩. বিষ্ণুপুরাণ - এটি মূলত বৈষ্ণদেব একটি ধর্মীয় গ্রন্থ।

৪ শিবপুরাণ - শিব মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে এই পুরানে। এর অন্য নাম বায়ুপুরান।

৫. ভাগবত পুরান - পুরান - উপপুরাণ মিলিয়ে ছত্রিশটি গ্রন্থ তার মধ্যে ভাগবত সর্বাধিক জনপ্রিয়। এটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পুরাণগুলির মধ্যে ভাগবতই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় ভাষায় (ফরাসী) অনূদিত হয়। গ্রন্থটি বারোটি স্কন্ধ বা বিভাগে বিভক্ত এবং ১৮০০০ শ্লোক সম্বলিত। এতে ৩৩৫টি অধ্যায় আছে। ভাগবতের রচয়িতা হিসেবে ব্যাসদেবের নাম প্রচলিত। শুকদেব তার পিতা ব্যাসদেবের কাছে ভারত কাহিনী শুনেছিলেন। রাজা পরীক্ষিত ঋষিশাপে অভিশপ্ত হলে শুকদেব তাকে ভাগবত কথা শোনান। পৌরাণিক মতানুযায়ী তাই ব্যাসদের ভাগবতের শ্রষ্টা। তবে কোন পুরানেই নিদিষ্ট কোন রচয়িতা ছিল না। এগুলি মূলত সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় রচিত। কাল-কালান্তর ধরে তা রচিত। ভাগবতের বারোটি স্কন্ধের বিষয় নিম্নরূপ -

প্রথম স্কন্ধ : ভাগবত কথা ও ভাগবদ ভক্তির মাহাত্ম্য, নারদ-ব্যাসদেরব সংবাদ, করুক্ষেত্রে কৃষ্ণ, পান্ডবের মহাপ্রস্থান ও পরীক্ষিতের কথা।

দ্বিতীয় স্কন্ধ : আগবত কথা রম্ভ ও পরীক্ষিৎ-শুকদেব সংবাদ

তৃতীয় স্কন্ধ : বিদুর-উদ্ধব সংবাদ, বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ, ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃত্তান্ত, কর্দম-দেবহূতি প্রসঙ্গ।

চতুর্থ স্কন্ধ : দক্ষযজ্ঞ, মনুর কন্যা বংশ, ধ্রুবর কাহিনী, বেনের কাহিনী, পৃথুর কাহিনী, প্রাচীনবর্হি ও প্রচেতাদের কাহিনী।

টিপ্পনী

পঞ্চম স্কন্ধ : প্রিয়ব্রতকথা, আগ্নীধ্র চরিত্র, ঋষভদেব চরিত্র, ভরত কাহিনী, ভূমন্দল, স্বর্গ-নরক-পাতালের বর্ণনা।

ষষ্ঠ স্কন্ধ : অজামিলকথা, দ্বিতীয় দক্ষবংশের বর্ণনা, বিশ্বরূপের কাহিনী, বৃত্রাসুরবধ, চিত্রকেতুর কাহিনী, সরুৎগণের জন্ম ও পুংসবন ব্রত।

সপ্তম স্কন্ধ : প্রহ্লাদ চরিত্র ও বর্ণাশ্রম ধর্মকথন।

অষ্টম স্কন্ধ : মন্বন্তর নিরূপন, গজেন্দ্র-উপাখ্যান, সমুদ্র মন্থন, মোহিনী-শিব সংবাদ, বালির কাহিনী, মৎস্য অবতার কথা।

নবম স্কন্ধ : ইলার বৃত্তান্ত, পৃষধ্রের উপাখ্যান, মনুর পুত্রদেব বংশবিস্তার,ল সুকন্যার কথা, রেবতীর কথা, অম্বরীষ কথা, হরিশচন্দ্রচরিত, সগর চরিত, রামচরিত ইত্যাদি।

দশম স্কন্ধ : মূলত কৃষ্ণলীলা কথা বর্ণিত। কৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবণলীলা, মথুরালিলা, কুরুক্ষেত্র কাহিনী বর্ণিত।

একাদশ স্কন্ধ : যদুবংশ ধ্বংস, কৃষ্ণের দেহত্যাগ।

দ্বাদশ স্কন্ধ : ভক্তিযোগ বর্ণিত।

৬. নারদীয় পুরান : বিষ্ণুকথা, হরিভক্তি, বৈষ্ণবধর্ম কথা বর্ণিত।

৭. লিঙ্গপুরাণ : শৈবধর্মের কাহিনী চিত্রিত।

৮. মার্কেন্ডেয় পুরাণ : বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনায় পূর্ণ।

৯. অগ্নিপুরাণ : ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যে রচিত।

১০. ভবিষ্যপুরাণ : সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, চতুবর্ণের সংস্কার, আশ্রমধর্ম বর্ণিত।

১১. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ : কৃষ্ণকথা বর্ণিত

১২. বরাহপুরাণ : ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারের কথা বর্ণিত।

১৩. স্কন্দপুরান : শৈবপুরাণ। এটির সাতটি খন্ড। মহেশ্বর, বৈষ্ণব, ব্রহ্মা,

কাশী, অবন্তী, নাগর ও প্রভাস। এর মধ্যে কাশীখন্ডই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

১৪. বামনপুরাণ ; বিষ্ণু ও শিবের মাহাত্ম্য প্রচারিত।

১৫. কূর্মপুরাণ ; ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ - এই চতুবর্গ ফলপ্রাপ্তির সম্পর্কে বিষ্ণু প্রচার করেন কূর্ম রূপে।

১৬. মৎস্য পুরাণ ; মনু ও মীনরূপী বিষ্ণুর বাক্যালাপ, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, রাজবংশ বর্ণনা, ধর্ম-নীতি ইত্যাদি বিষয় উল্লেখিত।

টিপ্পনী

১৭. গরুড় পুরাণ : এটিও বৈষ্ণব পুরাণ। এতে জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, বাস্তুবিদ্যা, রত্নপরীক্ষা ইত্যাদি বর্ণিত।

১৮. ব্রহ্মান্ড পুরাণ : এতে ব্রহ্মান্ডে সৃষ্টির রহস্য, কল্প, যুগভেদ, মন্বন্তর, রাজবংশ, বর্ষ, ভারতবর্ষ ও বিভিন্ন দ্বীপের কথা আছে।

৩.১.২ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : মালাধর বসু

তুর্কী আক্রমণের (১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্ভবত) পরবর্তিকালে বাংলাদেশের সমাজ-পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ওপর এক বিরাট আঘাত নেমে এল ; কাতারে কাতেরে মানুষকে হত্যা করা হল। বাংলার ভাগ্যাকাশে এক গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি নেমে এল। প্রায় মানবশূন্য হয়ে পড়ল বাংলা। অবশিষ্টাংশ মানুষজন বাঁচার তাগিদে পাশ্ববর্তী নিরাপদ জায়গায় চলে গেলেন। যারা রইলেন তাদেরকে অনেক নির্যাতন সহ্য করে থাকতে হল। এমন বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে বাঙালীকে নতুন আশার আলো দেখানোর মতো কেউ রইলেন না। এ পরিস্থিতি দীর্ঘকাল (প্রায় ১৫০ বছর) বিরাজ করল। এখান থেকে মুক্তির সন্ধান চলল। বাস্তবে কোন যুগনায়ন কে তখনো পর্যন্ত দেখা না গেলেও চিন্তাশীল লেখকের কলম সেই মুক্তিকামী নেতার সন্ধান দিতে চাইলো। বোধহয় সেই তাগিদ থেকে রামায়ন, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ। রামচন্দ্র, কৃষ্ণ - নায়ক হয়ে উঠে আসে। শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

"বাঙলাদেশে তখন বিদেশী বিধর্মী এক ভিন্ন জাতির শাসনকর্তা বর্তমান, জাতির জাগরণের জন্য তাই এমন এক মহান আদর্শ পুরুষের চিত্র উপস্থাপনা দরকার, যিনি সর্বতোভাবে জাতির জীবনে প্রেরণা জোগাতে পারবেন। এ বিষয়ে যে ভগবাণ শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাতে সন্দেহ কি?"

(সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয় : আদি ও মধ্য)

কাজেই কবি মালাধর বসু যে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ভাগবতের অনুবাদ করেন অনুমেয়। আর কৃষ্ণকথার জন্য ভাগবত পুরাণই শ্রেষ্ঠ। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই গ্রন্থটিকেই মালাধর অনুবাদের জন্য বেছে নেন।

কৃষ্ণের মত জাতীয় নায়কক, তাঁর কথা, আদর্শকে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাইলেন কি। এ উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট হয় যখন দেখা গেল তিনি সমগ্র ভাগবত অনুবাদ করলেন না, বারোটি স্কন্ধে সসম্পূর্ন ভাগবতের মাত্র দুটি স্কন্ধ - দশম, একাদশ অনুবাদ করলেন। এই দুটি স্কন্ধেই মূলত কৃষ্ণকাহিনী বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণলীলার আকারে। ফলে কৃষ্ণকাহিনী বেছে নেওয়ার কারণ আরো নিদিষ্ট হল এই স্কন্ধের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে।

৩.১.৩ কাব্যরচনাকাল

টিপ্পনী

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থটি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। রাধিকানাথ দত্ত ও কেদারনাথ দত্ত এই সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতে কাব্যটির রচনাকাল বিষয়ক একটি শ্লোক আছে, তা হল -

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।

চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।

অর্থাৎ ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩ খ্রীঃ) গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং ১৪০২ শকাব্দে (১৪০০ খ্রীঃ) কার্যটি সমাপ্ত করেন। আবার এক জায়গায় কবি লেখেন -

"গুণ নাঞি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।

গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুনরাজ খান।"

এখানে একটা সংশয় দেখা দেয় তা হল গৌড়েশ্বরের পরিচয় নিয়ে। কেননা কবি যখন কাব্যরচনা শুরু করেন তখন গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন রুকুন্উদ্দিন বরবক শাহ (১৪৬০ - ১৪৭৪ খ্রীঃ)। আর যখন কাব্যটি সমাপ্ত হয় তখন ছিলেন শামস্ উদ্দিন য়ুসুফ্ শাহ্ (১৪৭৪ খ্রীঃ - ১৪৮১ খ্রী :)। এই দুই গৌড়েশ্বরের মধ্যে কবি কার কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন তা নিয়ে দ্বিধা আছে। কেননা কবি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এর শুরু থেকে 'গুনরাজ খান' উপাধি ব্যবহার করেছেন। তাতে অনেক সমালোচকের মনে হয়েছে কাব্যারম্ভের পূর্বেই কবি এই উপাধি লাভ করেন। সে ক্ষেত্রে রুক্নউদ্দিন বারবাক শাহেরই সম্ভনা দেখা দেয় কবিকে উপাধি প্রদানের।

কবিপরিচিত

মালাধর বসু বর্ধমান জেলার জামালপুর অন্তর্গত বর্তমান মেমারি রেলস্টেশনের কাছে কুলীন গ্রামে কুলীন কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহন করেন। কাব্যের শুরুতে কবি আত্মপরিচয় দিয়ে লেখেন -

"বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।

জার পুর্ন্যে হৈল মোর নারা অনে মতি।"

তাঁরপিতা - ভগীরথ, মাতা - ইন্দুমতি। মূলততাঁরা বৈষ্ণব ছিলেন। পিতা - মাতার পুর্ণ্যফলে কবির মনে কৃষ্ণভক্তি সঞ্চারিত হয়। ফলে তিনি এ কাব্য রচনা করে। এছাড়া তিনি ব্যাসদেবের স্বপ্নাদেশও পান।

মালাধর বসু ছিলেন সম্পন্ন ব্যক্তি । তার পরিবার তৎকালে বেশ প্রতিপত্তিশীল ছিল। কর্মসূত্র কবি তৎকালীন রাজধানী (বাংলার) গৌড়ে থাকতেন। অনেকের অনুমান 'ছত্রী' নামের কোন সামরিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' এ এই সম্বন্ধে জানা যায় -

টিপ্পনী

"গুনরাজ ছত্রী তনয় মহাশয়

নানা মহোৎসব করি।"

আর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মালাধর বসুর গ্রামের কথা। কূলীন গ্রামের কুলীন কায়স্থ বংশে তার জন্ম। স্বয়ং চৈতন্যদেব কবির গ্রাম সম্পর্কে তাঁর (কবির) আত্মীয় সত্যরাজ খান ও রামানন্দকে বর্ণনা করেছেন। এই বলে -

"প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।

সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহ দূর।।

কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।

শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়।।"

কুলীন গ্রাম সম্পর্কে চৈতনদেবের ভালোবাসারই প্রকাশ পেয়েছে এখানে। এছাড়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও কুলীনগ্রাম পরিদর্শন করে তার বিবরণ দিয়েছেন ১২৯৩ বঙ্গাব্দে। তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হচ্ছে -

"বঙ্গভূমির মধ্যে 'কুলীন গ্রাম' একটি প্রসিদ্ধ পুরাতন জনপথ। 'মেমারী' ষ্টেশন বা 'বৈঁচি'; ষ্টেশন হইতে ঐ গ্রামে যাইবার পথ আছে ; কিন্তু উভয় পথই তিন ক্রোশের কম নয়। আমরা প্রথমে উক্ত গ্রামের এক প্রান্তস্থিত 'রাণাপাড়া' গ্রামে শ্রীশ্রী শ্যামদাস আচার্যের প্রকাশিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির দর্শন করিলাম। সেই মন্দিরের উপরে যাহা লেখা আছে, তাহেতে বুঝা গেল যে, ঐ মন্দির ১৬১৪ শকে নির্মিত। তথা হইতে আমরা মহানুভব শ্রীশ্রীমালাধর বসু উপাধিকে গুনরাজ খান মহাশয়ের বাসস্থানের চিহ্ন ও তৎচতুর্দ্দিকস্থিত গড়ের সীমা দর্শন করিতে গেলাম। তদ্দর্শনান্তে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থান দর্শন করিলাম। পরে শ্রী সত্যরাজ খানের প্রতিষ্ঠিত দেব মূর্ত্তি সকল ও অবশেষে শ্রীশ্রীরামানন্দ বসুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। গোপালের অনতিদূরে একটি শিবের মন্দির। সেই মন্দিরে একটি বৃষ আছে, তাহার গলদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে :

শকে বিশতি বেদে খে মনৌ শিব সন্নিধৌ।

খান - সত্যরাজন স্থাপিতো য়ং ময়া বৃষ ।।

৩.১.৪ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : নামকরণ

মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটি একাধিক নামে পরিচিত । 'গোবন্দবিজয়', 'গোবিন্দমঙ্গল' এমনকি 'শ্রীকৃষ্ণবিক্রম' নামও পাওয়া যায় কাব্যটির। তবে কাব্যটির ভূমিকাংশে (বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুঁথিতে) 'কৃষ্ণের বিজয়' ও 'গোবিন্দ বিজয়' -ই লেখা আছে। কৃষ্ণের নাম গোবিন্দ বলেই বোধ হয় এমন নামকরণ । 'গোবিন্দবিজয়' নামকরণ থাকলেও পরবর্তীতে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বলেই কাবটি জনপ্রিয় হয়। আবার মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কাব্যটিকে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বলেই উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে, মহাপ্রভু কাব্যটির প্রশংসা করে বলেন -

"গুণরাজ খান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেময় - ।।

'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।

এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ ।।"

এবার দেখে নেওয়া যাক 'বিজয়' শব্দটি ব্যবহারের পিছনে কি কারণ ছিলো। 'বিজয়' শব্দটি বৈদিক গোত্রের। ঋকবেদে 'বিজয়' শব্দটি 'জয়' হিসেবেই ব্যবহৃত । আবার মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে 'বিজয়' শব্দটি 'অভিযান' অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া 'বিজয়' শব্দটির অন্যান্য অর্থগুলি হল - 'বিক্রমচরিত্র' আগমন, গমন ও যাত্রা । আবার কৃষ্ণের জন্ম মুহূর্তটিকে বিজয় বলা হয় । ভগবান কৃষ্ণ অভিজিৎ নক্ষত্রে জয়ন্তী রাত্রিতে বিজয় মুহূর্তে জন্মালেন । তবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামকরণের কারণ হিসেবে বলা যায় দানবদের অত্যাচারে জর্জরিত এক চরম দুর্দিনে দৈত্যদের পরাভূত করার জন্যই কৃষ্ণের আর্বিভাব । তাই সেই দিক থেকে কৃষ্ণ চরিত্রের উৎকর্ষ, ঐশ্বর্য সমারোহ, বীরত্ব, বীর্যবত্তা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল কবির মূল লক্ষ্য। তাই 'গোবিন্দ বিজয়' বা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামকরণ করা। এই নামকরণ সেই দিক থেকে সার্থক।

৩.১.৫ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : কাহিনী

মধ্য যুগের কাব্যের শুরুতে সাধারণত দেবদেবির আশীর্বাদ প্রার্থনা থাকে । 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' শুরুতেই সেই ঐতিহ্য অনুসারে আছে দেবদেবী বন্দনা। রাধা-কৃষ্ণ-গনেশ-ব্রহ্মা-মহেশ্বর- লক্ষ্মী-সরস্বতি-ইন্দ্র প্রমুখ দেবদেবীর বন্দনা করে কাব্য শুরু হয়েছে। এরপর 'গ্রন্থের বিষয় নির্বাচন' প্রসঙ্গ। এখানকার মূল কথা হল -

টিপ্পনী

"ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।

লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।

সুন হে পন্ডীত লোক একচিন্ত মনে।

কলি ঘোর তিমির জাতে বিমোচনে।।"

টিপ্পনী

অর্থাৎ লোক নিস্তারের জন্য তিনি ভাগবতের কথাকে পয়ারে রচনা করে প্রকাশ করতে চান। এছাড়া ঘোর কলিকালের অন্ধকারময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তির আশাও তিনি পোষন করেছেন।

এরপর নারায়নের বাইশ অবতারের বর্ণনা আছে। প্রথমে ব্রহ্মা হলেন দেব শ্রীহরি। দ্বিতীয়তে বরাহ অবতার হয়ে পৃথিবী উদ্ধার করলেন। তৃতীয় অবতার হলেন নারদমুনি। চতুর্থতে নরনারায়ন অবতার, পঞ্চমা বতার হলেন কপিলমুনি, ষষ্ঠতে হলেন দত্তাত্রেয় মহাযোগী, সপ্তম অবতার যজ্ঞরূপ দক্ষিনা সহচরী, অষ্টমেতে জড়রূপে ভরত অবতার, নবমে পৃথু অবতার, দশমে মীনরূপে বেদ উদ্ধার করলেন, একাদাশে কুর্ম অবতার, দ্বাদশে ধন্বন্তরি অবতার, ত্রয়োদশে স্তরীরূপে অসুরদের মোহিত করে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত এনে সুরদের অর্থাৎ দেবতাদের তুষ্ট করলেন। চতুর্দশ অবতার নরসিংহ। নরও সিংহের অর্ধেক অর্ধেক শরীর প্রাপ্ত হিরণ্যকসিপু রাক্ষস মেরে রক্তপান করলেন। পঞ্চদশে বামণ অবতার হলেন, পরশুরাম রূপে ষোড়শ অবতার। সপ্তদশ অবতার ব্যাসরূপে বেদের ব্যাখ্যা দিলেন। অষ্টাদশ অবতার রামচন্দ্র, সাগরে বাঁধ দিলেন, রাবণনিধন করলেন। ঊনবিংশ অবতার হলেন বলরাম, বিংশতিতে কৃষন, একবিংশতি বৈকুন্ঠ বদ্ধ জগতভুবন। দ্বাবিংশতি অবতার কল্কে। এই গেল অবতার বর্ণনা। এরপর অতিসংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি। বাবা ভগীরথ, মা ইন্দুমতি - এঁদের পুন্যফলে কবির নারায়নে মতি। তারপর লীলাসূত্র বর্ণনা। অর্থাৎ কাহিনীর পরম্পরা বা সূচীর বর্ণনাল শুরুতে কৃষ্ণের জন্ম কাহিনী, তারপর পুতনা বধ, শকটভঞ্জন, তৃনাবর্ত বধ, মৃত্তিকা ভক্ষন, গর্গমুনির নামকরণ, ধান দিয়ে ফল কেনা, দই খেয়ে পাত্র ভাঙা, দুই কুবের কুমারের শাপমোচন, গোলমাল দেখে নন্দের গোকুল ত্যাগ এবং যমুনার কুলে বসবাস। বৎসাসুর বধ, বকাসুর বধ, অঘাসুর ব, ব্রহ্মমোহন, ধেনুক বধ, তালখাওয়া, দাবানল গিলে ফেলা, প্রলম্ব বধ, অগ্নিপান, গোপিকার বস্ত্রহরণ, যজ্ঞপত্নী স্থানে অন্নভক্ষন, পর্বত ধারনে গোকুল রক্ষা, ইন্দ্রের আগমন ও সুরভি দুধে অভিষেক, বরুনের পুরী থেকে নন্দ উদ্ধার, রাসক্রীড়া, সাপ হত্যা করে সুদর্শনের অভিশাপ খন্ডন, শংখাসুর বধ, অরিষ্ট বধ, কেশীবধ, অক্রূর কৃষ্ণকে মধুপুরে আনে, রজক বধ, মালাকারও কুরজিকে বরদান, মধুপুরের ধনুভঙ্গ, মল্লযুদ্ধে বীরত্বপ্রদর্শন, চাণূর মুষ্টিক বধ, কংস বধ -

"চানুর মুষ্টিক দুই বিরে মাইল একেবারে।

মঞ্চে হৈতে পড়িঞা গোসাঞী কংস রাজা মারে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

কংস মহিষীর বিলাপ, মথুরায় উগ্রসেনের অভিষেক, কৃষ্ণের পিতৃমাতৃ পরিচয় লাভ, গুরুর নিকট চৌষট্টি বিদ্যা শিক্ষা, গুরুর মৃত পুত্র উদ্ধার, মথুরায় কুব্জি ও অক্রূরের গৃহে গমণ, উদ্ধবকে পাঠিয়ে গৌপনারীদের সান্ত্বনা দান, জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ, সমুদ্র মজিয়ে দ্বারকা নগরী নির্মাণ, গৌতম দাহন, দ্বারকায় কৃষ্ণের যাত্রা, কলিযবন বধ, মুচুকুন্দের মুক্তি, রেবতির সঙ্গে বলরামের বিয়ে, রুক্মিনীর স্বয়ম্ভব, নগ্নছিতা ও লক্ষ্মণার সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে, নরকরাজ বধ, সম্বর বধ, ইন্দ্রকে জয় করে পারিজাত নিয়ে আসা, রুক্মিনীর সঙ্গে রভস ক্রীড়া, ঊষা-অনিরুদ্ধের বিয়ে, নৃগ(মৃগ) রাজার শাপবিমোচন, বলদেবের বিক্রমে দুর্যোধনের কন্যাহরণ, যমুনা সঙ্কর্ষণ, দ্বিবিধ বানরবধ, নারদমুনি দ্বারকা নগরের প্রত্যেক ঘরেনারায়নকে প্রত্যক্ষ করলেন, কৃষ্ণ শৃগাল - বাসুদেবকে হত্যা করলেন, কাশীপুরী দাহ, ভীম কর্তৃক জরাসন্ধ বধ, রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল বধ, শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধ, প্রদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধ, বলদেব কর্তৃক রুক্কি ও দন্তবক্রের নিধন, বজ্রনাভ বধ, সুদামা বিপ্রের দ্বারকায় গমন, সূর্যমণি স্যমন্তক নিয়ে রাজার গমন, কৃষ্ণের হৃদয়ে ভৃগুমুণির পদাঘাত, বড়ুরূপে বৃকাসুরকে ভস্মীভূত করা, ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র উদ্ধার, বলিরাজার পুরী থেকে দৈবকীর ছয় মৃত পুত্র উদ্ধার, সুভদ্রা হরণ, দ্বারকা নগরে বৈকুণ্ঠপুরী নির্মাণ করতে ব্রহ্মাদি দেবতাদের গদাধরকে নির্দেশ, উদ্ধবকে যোগশিক্ষাদান, উদ্ধবকে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন, প্রভাসে যাদবগণের যুদ্ধে মৃত্যু ও স্বর্গলাভ।

এরপর আছে 'পৃথিবী রোদন'। অর্থাৎ কংসাদি মহাসুরদের অত্যাচার থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য দেবী সরস্বতী রসাতলে গিয়ে প্রজাপতিকে সমস্যার কথা জানালেন। ক্ষিরোদ সাগরের উত্তরে অবস্থিত শ্রীহরির কাছে গিয়ে প্রতিকারের আবেদন জানাবেন বলে স্থির করলেন ব্রহ্মা গ্রহ দেবগন। ব্রহ্মা চতুর্মুখে এবার নারায়নের কাছে সমস্যার কথা নিবেদন করলেন। তখন নারায়ণ দেবতাদের অভয় দেন। জানানবসুদেবপত্নী দৈবকীর গর্ভে নারায়ন যদুরাজ রূপে জন্ম নেবেন। প্রথমে দৈবকীর ছয় পুত্রকে কংস হত্যা করবে। সপ্তমে অংশ অবতার, অষ্টম গর্ভে স্বয়ং নারায়ন জন্ম নেবেন। এরপর 'দৈবকীর বিবাহ' দিলেন কংস বসুদেবের সাথে। তারপর কংস আকাশবাণীতে জানতে পারেন নিজের মৃত্যুর কথা। কংস নিজের ভগ্নিকে হত্যা করতে চাইলে বসুদেব তার সমস্ত সন্তানকে কংসের কাছে এনে দেবে বলে সম্মত হলে কংস দৈবককে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। এরপর আছে 'কংসের প্রতি নারদের উপদেশ বাণী'। নারদ কংসকে নিজের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দিলে কংস একসঙ্গে দৈবকীর ছয়পুত্রকে হত্যা করে। বসুদেব ও দৈবকীকে কারাগারে বন্দী করা হয়। দৈবকীর তখন সাতমাস গর্ভ। যোগ নিদ্রায় ভগবতী তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে নিদ্রাছলে সেই গর্ভ রোহিনীর উদরে প্রবিষ্ট করলেন। কংসের কাছে দৈবকীর গর্ভপাতের সংবাদ গেল। এরপর রোহিনী ফুটফুটে সুন্দর এক পুত্রের জন্ম দিলেন।

এবার আছে 'কৃষ্ণের জন্ম' কথা। পুনরায় গর্ভ সঞ্চার হয়। সে খবর অনুচরেরা কংসকে দেয়। কংস এবার প্রতিমাসে খবর জানতে চাইলেন। কারণ এই

টিপ্পনী

সন্তান কংসের মৃত্যুর কারণ হবে। দেখতে দেখতে দশমাস গর্ভ হল দৈবকীর। বন্দীশালায় প্রহরী সংখ্যা দ্বিগুন করা হল। ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির প্রথ প্রহরে দ্বার রক্ষীরা নিদ্রিত হল। দ্বিতীয় প্রহরে চন্দ্রের উদয় হল। লগ্নে বৃহস্পতি ভৃগুর পুত্র, বৃষের উদয় চান্দে যখন ভূমিসুত, তুলায় শশী, কন্যায় বুধ - এমন সব গ্রহের সমাবেশে কৃষ্ণের জন্ম হলে দশদিক পুলকিত হল। জন্মক্ষণে কৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী নারায়ন রূপে প্রকাশিত হলেন। দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী। দেবগণ নারায়ন বন্দনা করলেন। দৈবকী দেব ও করজোড়ে নারায়নের স্তুতী করলেন। কৃষ্ণ তখন দৈবকিকে বলেন -

টিপ্পনী

"ত্রেতা যুগে তোমার জথা জন্ম ছিল।

আমাকে ভকতি করি স্তুতি বড় কৈল।।

দেবমানে তপ কৈলে দ্বাদস বৎসর।

নিরাহারে দোঁহে তপ কইলে বিস্তর।।

তপ ফলে তবে আমি এইরূপ ধরী।

আপনে সদয় আমি হইলাম শ্রীহরি।

অর্থাৎ ত্রেতাযুগে তুমি আমাকে ভক্তি ও স্তুতি করেছিলে। দ্বাদশ বৎসর নিরাহারে দু'জনে তপস্যা করেছিলে। সেজন্য আমি তোমাদের প্রতি সদয় হয়ে পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছিলাম। এরপর আরো বললেন, সে জন্মে আমার নাম হয়েছিলো উপেন্দ্র। এ জন্ম তৃতীয় জন্ম।এই জন্মে অসুর বধ করে পৃথীবীর ভার খন্ডন করবো। যাইহোক, এদিকে বসুদেবের নিগড় খসল। সকল দুয়ার উন্মুক্ত হল প্রহরীরা নিদ্রা গেলে সদ্যজাতকে কোলে নিয়ে বসুদেব গোকুল গেল। মহামায়া শৃগালীর রূপ ধারণ করে আগে আগে চলে। ফনাছত্র ধরে বাসুকী পেছনে চললেন। যমুনার জল হল হাঁটুসমান। বাসুদেব তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চললেন। কৃষ্ণ সেই জলে লাফিয়ে পড়লেন। বাসুদেব হাহাকার করে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। বসুদেব নন্দের গৃহে পৌঁছলে যশোদা কন্যা প্রসব করে নিদ্রা গেলেন। পুত্রকে সেখানে রেখে কন্যাকে নিয়ে তিনি মধুপুর ফিরে এলেন। দৈবকীকে কন্যা দিয়ে বসুদেব সব কথা জানালেন। নবজাত কন্যার কান্না শুনে প্রহরী কংসকে জানালো। কংস দৈবকীর কোল থেকে কন্যা কেড়ে নিয়ে শিলার উপর আছাড় মারলে সে কন্যা অষ্টভূজা রূপে ধরে কংসকে বললে -

"তোমা বধিবাকে হইল পুরূষরতন।

গুকুলে পুরূষবর জন্মিল এখন।।

এরপর কংস আসন্ন মরণ আশংকায় কাঁদতে কাঁদতে সব পাত্র মিত্রকে ডাকেন। অসুরদের নির্দেশ দেন, গোকুলের সকল শিশুকে হত্যা করতে। এবার কৃষ্ণকে হত্যার কৌশল শুরু হয়। প্রথমে পূতণা রাক্ষসী কৃষ্ণকে বিষস্তন পান

করানোর উদ্দেশ্যে গোকুলে আসে। উপকথা শুনিয়ে কৃষ্ণকে বিষস্তন পান করায়। কৃষ্ণ প্রবল শক্তিতে সে স্তন পান করলে পূতনা আর্তচিৎকার করে প্রাণত্যাগ করে। পুতনার মাতৃলোক গতি হয়। এবার 'শকট ভঞ্জন' কাহিনী। তৃনাবর্ত বাঘ রূপে গোকুলে আসে কংসের নির্দেশে। সে বাতাসের গতিতে ধাবিত হয়ে কৃষ্ণকে শূন্যে তুলে নেয়। কৃষ্ণ তাকে সেখানে গলা টিপে ধরে। তৃণাবর্তর মৃত্যুঘটে। যশোদা কৃষ্ণকে কোলে তুলে গৃহে নিয়ে গিয়ে রক্ষাসূত্র বাঁধেন। কৃষ্ণ হেসে হাই তুললে যশোদা তাঁর উদরে সকল ভুবন দেখে -

"তাঁর উদরে দেখে জসো সকল ভুবন।।"

টিপ্পনী

এবার গর্গমুনির উপস্থিতিতা কৃষ্ণও বলরামের নামকরণ হয়। এরপর কৃষ্ণর মৃত্তিকা ভক্ষন। মাটি খেলে পরে যশোদা বিব্রত হন। কৃষ্ণ তার মুখের মধ্যে পৃথিবী দর্শন করান যশোদাকে। এভাবে চলে কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া। দই-দুধ খেয়ে ভান্ড ভেঙে ফেলা। যশোদার কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বাঁধা এ সমস্ত ঘটনা বর্ণিত হয়। কৃষ্ণ যমল অর্জুনকে নারদমুনির অভিশাপ ফল থেকে মুক্ত করেন। তারপর আছে ফল বিক্রেতার কাছ থেকে ধানের বিনিময়ে কৃষ্ণের ফল কেনা। সব ধান রত্নে পরিণত হওয়া ল বৎসাসুর হত্যার কথা আছে এবার। বকাসুরকে হত্যা করেন কৃষ্ণ। অজগর রূপী অঘাসুরকে হত্যা করেন।

ব্রহ্মা কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হন। কৃষ্ণের দেব মহিমা প্রচারিত হয়। কৃষ্ণ ধেনুকাসুর বধ করলেন। কালীনাগ বধের মধ্যে দিয়ে কালীনাগের মুক্তি ঘটে। কৃষ্ণ দাবানল নিবারণ করেন। মায়াসুর বধ করেন। গোকুলের কন্যাদের বস্ত্রহরণ করেন, কৃষ্ণ অবশেষে ফেরত দেন। এরপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মন পত্নীদের কাছে কৃষ্ণের অন্ন প্রার্থনার কথা।

পরপর বর্ণিত হয় -ইন্দ্রপূজা নাশ ও গোবর্ধন ধারন, বরুন কর্তৃক নন্দহরণ, রাসলীলা, কাত্যায়নী মহোৎসব ও বিদ্যাধরের শাপমোচন, শঙ্খচূড় বধ, অরিষ্টবধ, কেশী বধ, ব্যোমআসুর বধ, অক্রূরের রথে কৃষ্ণের মথুরা গমন, অক্রূর কর্তৃক জলমধ্যে কৃষ্ণ বলরাম দর্শন , রজকের নিকট বস্ত্র প্রার্থনা, মালাকারের প্রতি কৃপা, কুবজির প্রতি কৃপা, ধনুর্ময় যজ্ঞশালায় কৃষ্ণ কর্তৃক ধনুর্ভঙ্গ, কুবলয় হস্তী বধ, কৃষ্ণের মল্লযুদ্ধ, চানুর ও মুষ্টিক বধ, কংসাসুর বধ, কংস সবংশে ধ্বংস হলে তার পত্নীগন বিলাপ করেন। কৃষ্ণ উগ্রসেনকে মথুরার রাজছত্র ও রাজদন্ড দান করলেন। অবন্তীপুরীতে সন্দীপানি দ্বিজের কাছে কৃষ্ণ চৌষটটি বিদ্যা শিখলেন। গুরুদক্ষিণা হিসেবে সান্দীপনির সমুদ্রে ডুবে যাওয়া সন্তানকে ফিরিয়ে দিলেন। এবার কৃষ্ণের গোকুলের কথা মনে পড়ল। কৃষ্ণের আদেশে উদ্ধব গোকুলে গিয়ে নন্দ ঘোষ, যশোদা ও গোপিদের সাত্বনা দিলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরা গেলেন ও কুবজির মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন। অক্রূরকে তুষ্ট করলেন। অক্রূর কৃষ্ণের আজ্ঞায় হস্তিনাপুর গেলেন। কুন্তীর দুঃখের কথা জানালেন। দুর্যোধের ঔদ্ধত্যের কথাও বলে। তৃরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণ বলরামের যুদ্ধ হল। জরাসন্ধ পরাস্ত হল। বলরাম তাকে হত্যা

করতে গেলে আকাশবানী শুনে বিরত হলেন। পুনরায় জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ আত্মগোপন করেন। কাল যবনের সঙ্গে মন্ত্রনা করে জরাসন্ধ। কালযবন ও পরাস্ত হয়। পরাস্ত কালযবন দূত প্রেরন করেন কৃষ্ণের নিকট। কালযবনের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হয় কৃষ্ণের। কালযবন ভস্ম হয়ে যায়। মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ দর্শন দেন ও বরদান করে বদরিকাশ্রমে প্রেরণ করেন।

টিপ্পনী

রেবত রাজার কন্যা রেবতী বিবাহযোগ্য হ'লে তার জন্য পাত্রের সন্ধানে রাজা রেবত কন্যাকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা রাজা বলভদ্রের সন্ধান দেন। বলভদ্রের সঙ্গে রেবতীর বিবাহ সম্পন্ন হল। বলভদ্রের লাঙলের স্পর্শে রেবতীর রূপ দ্বিগুন হল। এরপর কৃষ্ণ-রুক্মিনীর বিবাহ। বিদর্ভরাজ ভিস্মক কন্যা রুক্মিনীর বিয়ের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। পঞ্চপান্ডব, দ্রোন, কর্ণ জরাসন্ধ দুর্যোধনের একশভাই প্রমুখ এই সভায় যোগ দেন।ভিস্মক কৃষ্ণকে তার কন্যার যোগ্য পাত্র হিসেবে ঘোষনা করলে রুক্মিনীর দাদা রুকমী তার বিরোধিতা করে শিশুপালকে তার বোনের বর হিসাবে ঘোষনা করেন। জরা সন্ধ একে সমর্থন জানান। কিন্তু রুক্মিনী কৃষ্ণকেই স্বামী হিসেবে পেতে চান। কৃষ্ণকে দ্বারকায় গিয়ে ব্রাহ্মণ তা জানিয়ে আসেন। এদিকে শিশুপালের সঙ্গে বিবাহের আয়োজন হল। কৃষ্ণ সেখান থেকে রুক্মিনীকে তুলেনিয়ে গেলে রুক্মীর সঙ্গে বলরামের যুদ্ধ হয়। রুক্মী পরাস্ত হন। এদিকে ভিস্মক রাজ দ্বারকায় গিয়ে কন্যাকে নানারত্নে ভূষিত করেন। এরপর রুক্মিনীর গর্ভে কামদেবের জন্ম হয়। সে সম্বরকে বধ করে। এরপর স্যমন্তক মনির কাহিনী। এই মণির সূত্রে জাম্ববতী ও সত্যভামাকে কৃষ্ণ বিয়ে করেন।

এরপর কৃষ্ণ পঞ্চপান্ডবের মৃত্যুবার্তা শুনতে পান। প্রকৃত খবর নেওয়ার জন্য কৃষ্ণ হস্তিনাপুর গেলেন। স্যমন্তক মনির কারণে রাজা সত্রাজিতকে হত্যা করা হল। এদিকে অক্রূর শেষ পর্যন্ত মনি কৃষ্ণ ও তার স্ত্রীদের ফেরত দিলেন। এরপর নবযৌবনা সুর্যনন্দিনী কালিন্দীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে হয় খুব সমারোহ করে। তারপর আছে মিত্রবিন্দা ও ভদ্রার বিবাহ কাহিনী। কৃষ্ণ এদেরও বিবাহ করেন। লক্ষনামে বিবাহ করে কৃষ্ণ প্রচুর ধন রত্ন লাভ করলেন। এরপর কৃষ্ণ নরক ও মুর দৈত্যবধ করেন। এরপর নারদের কারণে সত্যভামা কৃষ্ণের প্রতি অভিমান করেন পারিজাতমালাকে কেন্দ্র করে। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে এসে দ্বারকায় রোপন করলেন। তাতে দ্বারকার জরা ব্যাধি দূর হল। কৃষ্ণ রুক্মিনীর পতিভক্তির পরীক্ষা নিলেন। এরপর বানরাজার কাহিনী আছে। তারপর আছে বান রাজার কন্যা ঊষা ও অনিরুদ্ধের স্বপ্নে মিলনের কথা। চিত্রলেখাকে ঊষা তার স্বপ্নে মিলনের কথা জানাল এবং অনিরুদ্ধের সঙ্গে বাস্তবিকই মিলিত হতে চাইল। চিত্রলেখার দ্যৈতকর্মে তা সম্ভব হল, ঊষা গর্ভবতি হল। বান রাজা এ খবর পেয়ে অনিরুদ্ধকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। এদিকে পাইকরা অনিরুদ্ধকে বন্দী করতে এসে পরাস্ত হয়ে ফিরে গেল। তখন বানরাজা অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্দী করলেন। ঊষা স্বামীকে মুক্ত করতে পার্বতীর স্মরণাপন্ন হলে পার্বতী অনিরুদ্ধকে বিপ্মুক্ত হওয়ার বর দিলেন। এরই মধ্যে অনিরুদ্ধ অদৃশ্য হলে চিন্তান্বিত পিতা কামদেব

কৃষ্ণের কাছে এলেন। কৃষ্ণ ধ্যানে জানালেন বাণরাজ তাকে লুকিয়ে রেখেছে। কৃষ্ণ তাকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু মহাদেব বাণের পক্ষ নিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে মহাদেবের ভয়ানক যুদ্ধ হল। মহাদেবপরাজিত। পার্বতি মোহিনী রূপ ধরে কৃষ্ণকে নিরস্ত করলেন। এবার বানরাজা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অবর্তীন হলে পরাজিত হলেন। এবং সন্ধি করলেন। অনিরুদ্ধ মুক্তি পেল। মহা ধুমধাম করে ঊষা-অনিরুদ্ধের বিয়ে হল।

এরপর নৃগরাজার উপাখ্যান। তারপর শাম্ব কতৃক লক্ষ্মনা হরণ এবং শাম্বকে বলদেবের সহায়তা দান। শেষ পর্যন্ত শাম্বর সঙ্গে লক্ষ্মনার বিয়ে হয়। এরপর বলদেবের বৃন্দাবন গমন ও যমুনা সঙ্কর্ষণ বৃত্তান্ত বর্ণিত। এবার শৃগাল বাসুদেব উপাখ্যান। তারপর আছে কৃষ্ণের বহুরূপ দর্শনে নারদের বিস্ময় ও আনন্দ। একদিন রাজসভায় বসে এমন সময় বার্তা পেলেন জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধের সময় যে রাজারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের সবাইকে জরাসন্ধ বন্দী করে প্রহার করছেন। এমন সময় নারদ জানান কৃষ্ণের সহায়তায় যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে চান। সেখানে জরাসন্ধ উপস্থিত থাকবেন। সেখানে ছদ্মবেশে গিয়ে তাকে অতর্কিত আক্রমনে হত্যা করতে হয়ে। হস্তিনাপুরে গেলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সাহায্যে রাজসূয় যজ্ঞ করতে চান তার স্বর্গত পিতৃ পুরুষগণের উদ্ধারের জন্য। কৃষ্ণের পরামর্শে ভীম পশ্চিমে গেলেন। উত্তরে অর্জুন, পূর্বে সহদেব, নকুল দক্ষিনে। চারদিক থেকে চারভাই প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করলেন। এবার জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী রাজাদের মুক্তির পরিকল্পনা করা হল। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন সন্ন্যাসীর সাজে জরাসন্ধের পুরীর দিকে গেলেন। যেতে যেতে ভীম জরাসন্ধের নামের কারণ জানতে চাইলে তার জন্মবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেন কৃষ্ণ। বললেন অর্ধেক অর্ধেক দেহ জুড়ে হয়েছে জরাসন্ধ। জরা রাক্ষসী তা করেছিলেন বলে এমন নাম। এবার জরাসন্ধের পুরীতে প্রবেশ করলে জরাসন্ধ বুঝতে পারেন এরা কোন ব্রাহ্মন সন্ন্যাসী নয়। তখন কৃষ্ণরা তাদের পরিচয় দিয়ে যুদ্ধ চাইলেন। ভিমের সঙ্গে যুদ্ধ হল। কিন্তু জরাসন্ধকে পরাস্ত করা গেল না। কৃষ্ণ একগাছা বেনাপাতা চিরে দুখন্ড করে ভীমকে দেখালেন। ভীম ইঙ্গিত বুঝে জরাসন্ধকে দ্বিখন্ডিত করলেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্রকে মগধের রাজা করলেন। বন্দী রাজারা মুক্তি পেলেন। এরা সকলেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগ দেন।

এই রাজসুয় যজ্ঞে আগত বেদব্যাস, ভরদ্বাজ নারদ প্রমুখ মুনিদের বরণ করা হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। এরপর কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অতিথি হিসেবে সংবর্ধিত করতে গেলে শিশুপাল ঐ যজ্ঞ সভাতেই কৃষ্ণ নিন্দা করেন। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধকরেন। নারদ এখানে শিশুপাল ও দন্তবক্রের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বলেন। যজ্ঞ শেষে সকল রাজা কৃষ্ণের গুনকীর্তন করতে করতে বিদায় নেন। এরপর আছে শাল্ব কর্তৃক দ্বারকা আক্রমণ, শল্বের মায়াযুদ্ধ, কৃষ্ণ পুত্র প্রদ্যুম্ন শাল্বকে বধ করেন কিন্তু সে অমরত্বের বরে আবার জাগ্রত হয়ে কৃষ্ণের পিতা বসুদেবকে হত্যা করে কৃষ্ণের সামনে তার মুন্ড আনে। কিন্তু কৃষ্ণ বোঝে এসব

টিপ্পনী

মায়া। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ তাকে বধ করেন। এদিকে অনিরুদ্ধের সঙ্গে রুক্মিনীর ভাই রুক্মী তার পৌত্রীর বিবাহ দেন। এরপর বলরামের সঙ্গে দন্তবক্র ও রুক্মীর পাশা খেলে এবং রুক্মী বধ। বজ্রনাভ ত্রিভুবন বিজয়ী বীর। সে তার ঔধ্যত্ব প্রকাশ করলে কৃষ্ণ পুত্র প্রদ্যুম্ন্যকে পাঠান তাকে বধ করতে। এদিকে বজ্রনভের তিন কন্যাকে কৃষ্ণের তিনপুত্র গান্ধর্ব মতে বিবাহ করলেন। শেষ পর্যন্ত নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেদিয়ে বজ্রনাভকে প্রদ্যুম্ন বধ করেন। বজ্রনাভের স্ত্রীগন বিলাপ করেন। কৃষ্ণ তাদের সান্ত্বনা দিয়ে নিজের পুত্রদের সঙ্গে তাদের তিন কন্যার বিয়ে দিয়ে ধনসম্পদ দ্বারকায় নিয়ে যান।

টিপ্পনী

দরিদ্র ব্রাহ্মন সুদামা সস্ত্রীক অবন্তী নগরে থাকতেন। দারিদ্র্যের কারণে সুদামা স্ত্রীর পরামর্শে সখা কৃষ্ণের কাছে সম্পদ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে দ্বারকায় গেলেন। অনেক অল-গলি - অলিন্দ পেরিয়ে সুদামা তার বাল্যবন্ধু কৃষ্ণের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ তাকে দেখে বিগলিত আনন্দাশ্রু ফেললেন। বন্ধুর জন্য আনা খুদ কৃষ্ণকে দিতে তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ সে খুদ নিয়ে খেলেন। অনেক গল্প কথায় রাত কাটল। সুদামা ফেরার সময় কৃষ্ণের কাছে কিছু চাইতে পারলেন না। স্ত্রীকে কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না। বাড়ি ফিরে এসে সুদামা যেখানে তার বাড়ি ছিল সেখানে বিরাট অট্টালিকা। প্রচুর মনি-মাণিক্য। ব্রাহ্মণী সুদামাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করেন। এরপর কৃষ্ণের প্রভাস গমন। প্রভাসে কৃষ্ণ মহিষীগণের কৃষ্ণপ্রীতি।

এবার বসুদেবের প্রভাস যজ্ঞ ও তার অনুষ্ঠান। সমস্ত রাজাদের আদর - আপ্যায়ন করা হল। মুনি-ঋষিরা যজ্ঞকুন্ড ঘিরে বসলেন। ব্রহ্মার সাক্ষাতে যজ্ঞাহুতি প্রদান করা হল। এরপর আছে ভৃগুমুনি কর্তৃক ব্রহ্মা মহেশ্বরের মাহাত্ম্য পরীক্ষার কাহিনী। এখানেও কৃষ্ণেরই জয় হল। ভৃগুর দ্বারা কৃষ্ণের মহিমা প্রচারিত হল জগতে। এবার আছে বৃকাসুর বধের কাহিনী। শিব বৃকাসুরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বৃকাসুরকে বর দিতে চাইলে সে বলে তাকে এমন বর দিতে হয়ে যে সে যার মাথায় হাত রাখবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। শিব তাই-ই দিলে। বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্য সে শিবকেই বেছে নিল। শিব রুদ্ধশ্বাসে পালিয়ে কৃষ্ণের কাছে এলে কৃষ্ণ বৃকাসুরকে নিজের মাথায় হাত রাখতে বলেন। বৃকাসুর তাই করে এবং ধ্বংস হয়ে যায়।

দ্বারকার অধিবাসী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মনী। ব্রাহ্মণী মৃত সন্তান প্রসব করেন। তারা মৃত পুত্র নিয়ে কৃষ্ণের কাছে আসেন। কৃষ্ণ বলেন এবার তার সন্তান হলে প্রদ্যুম্ন রক্ষা করবেন। কিন্তু দেখা যায় এরপর ব্রাহ্মণের আটটি সন্তান মারা যায়। এরপর যখন ব্রাহ্মণী আবার সন্তান প্রসব করেন তারও মৃত্যু হয়। অথচ অর্জুন ব্রাহ্মণকে বলেছিল তার সন্তান রক্ষা করবে। না পেরে নিজেই অগ্নিকুন্ডে আত্মাহুতি দিতে গেলে কৃষ্ণ তাকে আটকায় এবং কৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে বিষ্ণুলোকে গিয়ে দেখে ব্রাহ্মণের নয় পুত্রই সেখানে আছে। আসলে বিষ্ণু কৃষ্ণের দর্শনের জন্য এ কাজ করেন। ব্রাহ্মনের নয় পুত্র ফিরে আসে।

এবার কৃষ্ণে মাতা দৈবকী কৃষ্ণকে ব্রাহ্মণের তুলনা দিয়ে বলেন তোমার ছয় ভাইকে ফিরিয়ো আনো, যাদের কংস হত্যা করেছিল । কৃষ্ণ পাতালে গিয়ে বলিরাজের কাছ থেকে নিজের ছয় ভাইকে ফিরিয়ে আনেন । তারা কৃষ্ণের স্পর্শে মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে স্থান পায় । এরপর আছে কৃষ্ণের সহায়তায় অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের কাহিনী । এরপর অজমিল উপাখ্যান । অজামিলের সমস্ত পাপের নারায়নের নামে মুক্তি ঘটে ।

কৃষ্ণ সুখে আছে দ্বারকায় । পুত্র -পৌত্র নিয়ে । কিন্তু যে কৃষ্ণ ভূ-ভারত হরণের জন্য পৃথিবীতে গেলেন তিনি নিজেকেই নিজে বিস্মৃত হলেন । ব্রহ্মা সহ দেবতাদের চিন্তা বাড়তে লাগল । তখন ব্রহ্মা নারায়নকে একথা জানালে নারায়ন হেসে জানান চিন্তার কারণ নেই ব্রহ্মশাপে কৃষ্ণের যদুবংশ ধ্বংস হবে । তিনি আবার বৈকুণ্ঠে ফিরবেন । এরপর মুনীগণ কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দ্বারকায় এলেন । প্রদ্যুন্ন তাদের আপ্যায়ন করলেন । কিন্তু কৃষ্ণ মুনিগণকে দেখা দিলেন না । এমন সময় শাম্ব, 'মুসল উদরে দিয়া' গর্ভবতী রমনীর রূপ ধরে এসে মুনীদের বলেন একবছর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করছি কবে প্রসব হয়ে সন্তান এবং পুত্র না কন্যা হয়ে । শাম্বর এ ছলনায় দুর্বাসা বুঝতে পেরে ক্রোধে বলল 'এইখানে প্রসবিব দেখিব সর্বজনঃ । এবং এর থেকেই যদুবংশ ধ্বংস হয়ে -

"চলিতে পড়িল ভুয়ে লোহার মুসল ।

দেখিয়া কম্পিত হৈল কুমার সকল ।।"

কৃষ্ণ এসে বলেন এ শাপ খন্ডানো যায়ে না । তবে প্রভাসে গিয়ে এই মুসল ('মুসল' : একপ্রকার অস্ত্র) ঘর্ষণ করলে বিপদ থাকবে না । তেমন করা হল । কিন্তু মুসলের শেষাংশ থেকে গেল, ক্ষয় হল না । যদুগনা তা সমুদ্রে ফেলে দিল । সেটিকে একটি মাছ খেয়ে নিল । এক মৎসজীবি তা সংগ্রহ করে শিকারীকে বিক্রি করল । শিকারী সেই লোহা দিয়ে পশু শিকারের অস্ত্র তৈরী করল । এদিকে কৃষ্ণের মর্ত্যের দিন ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে জেনে উদ্ধব কৃষ্ণের কাছে তত্ত্বজ্ঞান চাইলেন । কৃষ্ণ তাকে সংসারের অসারতার কথা জানান । নারায়নই একমাত্র সার । এছাড়া উত্তম, মধ্যম, ও অধম ঈশ্বর আরাধনার কথা বলা হয় । এসব তত্ত্ব নারদমুনি দ্বারকায় এসে বসুদেবকে বলেন ।

উদ্ধব কৃষ্ণের কাছে জানতে চান - প্রকৃত গুরু কে ? কষ্ণ চতুর্বিংশতি গুরুত্বের কথা জানান । প্রথম গুরু পৃথিবী । সব ভার সহ্য করেও নির্বিকার । দ্বিতীয় গুরু পবন । সে কোথাও গুপ্ত নয় । তৃতীয় গুরু আকাশ তার বিশাল অস্তত্ব কিন্তু কোন প্রকাশ নেই । চতুর্থ গুরু জল । জল নির্মল ও সর্বজন প্রিয় । পঞ্চ গুরু হুতাশ । তার চরিত্রের কোন একদেশ দর্শিতা নেই । ষষ্ঠ গুরু চন্দ্র । কারণ সে 'আপনি না মরে পুন মলা করে ক্ষয়" । সপ্তম গুরু সূর্য । জলে স্থলে সর্বত্র সে পরিব্যপ্ত । অষ্ট গুরু কপোত । একেবারে তার চার সন্তান হয় । তারা সন্তানের জন্য আহার সংগ্রহ করে এনে দেখে তাদের চার সন্তান ব্যাধের জালে আবদ্ধ । কপোতী

টিপ্পনী

টিপ্পনী

জ্ঞান হারায় । ব্যাধ তখন তাকে হত্যা করে । বোঝা গেল শোকেতে মরে লোক সংসারে । নবম উরু অজগর । বনের মধ্যে সে মুখ খুলে থাকে । কখনো কোন আহার তার মুখে এসে পড়লেতবে সে খায় । নইলে অভুক্ত থাকে । তাকে দেখে আহার্য অন্বেষন বন্ধ করেছেন কৃষ্ণ । যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই আহার্য দেবেন । দশম গুরু সমুদ্র । বর্ষায় তার জলের প্রাচুর্য্যে আনন্দ নেই, গ্রীষ্মের অপ্রতুলতায় তার কোন দুঃখ নেই । একাদশ গুরু পতঙ্গ । সে খাবার সন্ধানে আগুনে পুড়ে মরে । অর্থাৎ বিষয়সক্তি মৃতুর কারণ । দ্বাদশ গুরু মৌমাছি । সঞ্চয়ই মৃত্যুর কারণ তা মৌমাছির কাছ থেকে শেখা যায় । চতুর্দশ গুরু করীবর । মায়া স্ত্রীর লোভে সে বন্দী হয় । পঞ্চদশ গুরু হরিণী । সঙ্গীতে মোহিত হয়ে সে প্রাণ যায় । ষোড়শ গুরু মৎস্য । বঁড়শিতে গাঁথা খাবারের লোভে তার প্রাণ যায় । সপ্তদশ গুরু পিঙ্গলা নামে গণিকা । এই বৃত্তিতে সে প্রচুর অর্থ রোজগার করে কিন্তু এক সওদাগর তাকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাকে তার সঙ্গে বসবাস করতে বলে । পিঙ্গলা তাই করলেও সদাগর কথা রাখেনি । তখন সে তীর্থ ভ্রমনে যায় । অষ্টাদশ গুরু কুরল পক্ষী । মাংসের লোভে তাকে সব পক্ষী উত্যাক্ত করে । ঊনবিংশতি গুর শিশু । সরলমতি হয় শিশুরা । বিংশতি গুরু কুমারী । তার প্রভাবে কুসঙ্গ দূর হয় । বিবাহ দিয়ে কণ্যাকে পিতা নিজগৃহে রাখল । একদিন কন্যাটি ধান কুটছিল । হাতের দুগাছা শঙ্খ থেকে ক্রমাগত শব্দ হচ্ছিল বলে একগাছা শঙ্খ ফেলে দিল । শব্দ বন্ধ হ'ল এখান থেকে শেখা যায় সঙ্গী পরিত্যাগ করে ঈশ্বরপদে মনোনিবেশ করার কথা । একবিংশতি গুরু বক । সে মাছের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখে । এতে বোঝা গেল কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ ভজনার কথা । দ্বাবিংশতি গুরু সর্প । নিজের বাসা নেই, পরের বাসাতেই সুখী । ত্রয়োবিংশতি গুরু মর্কট । তার ক্ষুদ্র দেহ 'বহুসূতা' । চতুর্বিংশতি গুরু কুমারিকা পতঙ্গ । সে পতঙ্গাদি কৃমি সংগ্রহ করে মাটিতে আচ্ছাদিত করে । একসময় ভরতরাজের কাছে এসে অবধূত একথা জানিয়ে ছিল । কৃষ্ণ তাই ব্যাখ্যা করলেন । উদ্ধব এসব শুনে আর জন্ম নিতে চান না । হরির পাদপদ্মেই নিজেকে সমর্পন করতে চান ।

এবার উদ্ধব কর্মযোগে বিষয়ে জানতে চান । নারায়ন তখন তাকে কায়াসাধনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন । মোহ বন্ধনই সব চাইতে বড় বন্ধন । কর্মের মধ্যে যেন কোন মোহ না জন্মায় । উদ্ধব জানতে চান তোমাকে পাওয়ার উপায় কি । তখন কৃষ্ণ বলেন তিনি সবেতেই বিরাজমান । এরপর উদ্ধবের অনুরোধে কৃষ্ণ তাকে বিশ্বরূপ দেখান । তারপর দেখান সাম্যরূপ । এবার কৃষ্ণ বলেন, ফলের আশা না করে কর্ম করো । এর পর চতুরাশ্রমের বর্ণনা ।

এরপর কাম, ক্রোধ থেকে যে পাপের সৃষ্টি হয় তার থেকে মুক্ত হতে নারায়ন যোগের বিধান দিলেন উদ্ধবকে । 'অমায়াসন' ও প্রাণায়ম' যোগসিদ্ধির পদ্ধতি । সুমিষ্ট ব্যবহার, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, নানা তীর্থ ভ্রমণের কথা তিনি বলেন । এছাড়া কায়াসাধনার নানান বিবরণ উদ্ধবকে কৃষ্ণ বলেন । অবশেষে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট কৃষ্ণের চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ উদ্ধব দর্শন করলেন । এই সমস্ত উপদেশ শুনে উদ্ধব ঘর, সংসার অর্থ ত্যাগ করলেন ।

একসময় যদুবংশ পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করল। কৃষ্ণ নিজে উদ্যোগী হলেন যদুবংশ ধ্বংস করার জন্য। নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগে শুরু হল দ্বারকায়। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সকলকে প্রভাসে তীর্থে গিয়ে স্নান করার পরামর্শ দিলেন। যদুবংশের পুত্ররা সবাই প্রভাসে গেল। স্নান করল। সেখানে কুমারেরা মধুপানে মত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করলেন। মুসল দিয়ে প্রত্যেকে যুদ্ধ করে মারা গেলেন। কৃষ্ণও সেই অস্ত্রের আঘাতে মারা গেলেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এসে দেহত্যাগের পরিকল্পনা করে গাছের ওপর উঠলেন। জরা নামের এক ব্যাধ কৃষ্ণের লোহিত চরণ হরিনের কান ভেবে মুসলের শেষ টুকরো দিয়ে আঘাত করে কৃষ্ণকে হত্যা করলেন। এরপর কৃষ্ণের মহিষীদের অনেককে দৈত্যগন হরণ করলে তারা পাথরের মূর্তিতে পরিণত হন। এর পেছনে ছিল অষ্টবক্রমুনির অভিশাপ।

টিপ্পনী

এরপর কলিকালের ফল বর্ণিত হয়। একালে ধর্ম অপেক্ষা অধর্মই প্রবল হবে। ব্রাহ্মণ তার বেদ অধ্যায়ন থেকে সরে গয়ে অর্ধ কর্মে লিপ্ত হয়ে। ছোটরা বড়কে, স্ত্রী স্বামীকে অমর্যাদা করবে। সৎ ব্যাক্তি দুঃখে থাকবে, অসৎলোক সুখী হয়ে। মানুষের গড় আয়ু হয়ে পম্চাশ বছর। যৌবনের কালসীমা বারো থেকে ষোলো বছর। সাত আট বছর বয়সে নারীরা গর্ভবতী হবে। এক গর্ভে তিন-চার সন্তান জন্মাবে। ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হয়ে প্রজাদের ধন সম্পদ লুঠ করবে। কলিকাল অধর্ম ও অরাজকতার পূর্ন হবে।

এরপর আছে পঞ্চপান্ডবের সংসার ত্যাগ করে উত্তরাভমুখে স্বর্গের পথে যাত্রা।

একেবারে শেষে কবি মালাধর বসু বলেন -

"অল্পবুদ্ধি অল্পমতি অল্প মোর জ্ঞান।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র এ কিছু করিনু বা খান।।"

মহাভারতে আরো বিস্তারিতভাবে কৃষ্ণ চরিত্রের বর্ণনা আছে। সেখান থেকেই সকলের বোঝার মত করে পাঁচালী প্রবন্ধে কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করা হল। এ কাব্য পাঠে পৃথিবীর সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় গরে বসেই তীর্থের লাভ হয়। একেবারে শেষে তিনি বলেন -

"পাসন্ড নিন্দক জনে কভু না সুনাইত।
জোড় হাতে বলো মুঞি বচন রাখিহ।।
সুক্ষ্ম মোক্ষ দুই এ তাহার সুনিলে।
ইহা বই ধন নাহি এই কলিকালে।।"

৩.১.৬ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় : শ্রেনী বিচার

শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যপ্রচারক ভাগবত আঠারোটি পুরাণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন

ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাছাড়া বৈষ্ণবরা এই গ্রন্থটিকে তাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করেন। এই গ্রন্থ অবলম্বনেই মালাধর বসু বা গুনরাজ খান (ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ) অনুবাদ করে রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। তবে কাব্যটি ভাগবতের হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ নয়। তিনি নিজেই জানিয়েছেন পন্ডিতদের মুখে শুনে বা কথকঠাকুরের মুখে শুনে তার অর্থ তিনি পায়ারের বেঁধে রচনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি ভাগবতের ভাবানুবাদ করেছেন। এটি অনুবাদ কাব্য শাখার অন্তর্গত।

টিপ্পনী

কাব্যটির মধ্যে আবার আখ্যাণ কাব্যের রূপ লক্ষ্য করা যায়। কারণ কাব্যটিতে বিভিন্ন কাব থেকে যেমন শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি থেকে উপাখ্যান সংগ্রহ করে সংযুক্ত করা হয়েছে।

কাব্যটিকে গীতিকার শ্রেণীভুক্তকরা যায় কিনা তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। গীতিকা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় লিখিত সাহিত্য। গীতিকা মুলত গাওয়ার জন্যই সৃষ্টি হল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় মিলিত একটি নিদিষ্ট অল্পকালের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছিল। কেননা তা আঞ্চলিক ভাষায় প্রচারিত।তার জনপ্রিয়তাও কম ছিল। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এ আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয় নি। এর জনপ্রিয়তাও বেশি ছিল। কাজেই একে গীতিকা গোত্রীয় কাব্য বলে চলে না।

কাব্যটি লোকসাহিত্যের অন্তর্গতও নয়। হ্যাঁ, এতে লোককথার কিছু উপাদান আছে কিন্তু লোক সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। লোকসাহিত্য মূলত মৌখিক, এর নিদিষ্ট লেখক পাওয়া যায় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' তো তেমন নয়। লোক কথার মধ্যে অলৌকিকতা বিরাজমান। এ কাব্যে কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত, তাঁর বিভিন্ন অসুরকে বধ করার মাধ্যমে অলৌকিকতা আছে। কিম্বা পুনর্জীবন প্রাপ্তি ইত্যাদি কাব্যের মধ্যে আছে। আসলে লোককথা কোথাও কোথাও কবিকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া কমলেকামিনী চন্ডীমঙ্গলের বিষয় সমুদ্রের ভিতরে পুরীর বর্ণনা রায়মঙ্গল কাবে আছে। এসব লোকসাহিত্যের বিষয়। সামগ্রিক ভাবে লোক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে 'শরীকৃষ্ণ বিজয়' প্রকাশিত হয় নি। কাজেই তা লোক সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। তাছাড়া মহাকাব্যগুলিতে এমন বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায়। মালাধর বসু তা কোথাও কোথাও অনুসরন করেছেন মাত্র।

এবার দেখে নেওয়া যাক মঙ্গলকাব্যের কি কি বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণবিজয় শুরু হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা দিয়ে। এরপর নারায়নের বাইশ অবতারের বন্দনা করা হয়েছে। গনেশ বন্দনা আছে। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বন্দনা আছে। মঙ্গলকাব্য গুলিতে আলাদা দেবদেবির বন্দনা আছে মঙ্গলকাব্যগুলিতে। তবে মালাধর বসুর কাব্যে লৌকিক দেবদেবীর কথা নেই। তাই দেব-দেবী বন্দনার ক্ষেত্রে দু-টি কাব্যের মধ্যে তফাৎ আছে।

এছাড়া মঙ্গলকাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ন অংশ হল, আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ। এখানে কবির আত্মপরিচয় থাকে বিস্তৃত ভাবে। এমনকি নানা

সমস্যা, সেখান থেকে উত্তরণ, আশ্রয় দাতা, পৃষ্ঠপোষকের আত্মপরিচয় অংশে কেবলমাত্র বাসস্থান ও নিজ পিতামাতার নামোল্লেখ করেছেন-

"বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।

জার পুর্ণ্যে হৈল মোর নারাঅনে মতি ।।"

কাজেই এক্ষেত্রেও বিশেষ মিল নেই। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মঙ্গলকাব্যের মতো বারমাস্যার বর্ণনা নেই, নেই চৌতিশা, বিবাহ আচারের নিখুঁত চিত্রণ নেই। তাই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কে 'গোবিন্দমঙ্গল' বলা হলে ও কাব্যের সঙ্গে তার মিল খুব কমই। মঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্যও বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এ।

আবার আর একটি মতামত উঠে আসে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সম্বন্ধে। কাব্যটিকে 'গোবিন্দবিজয়' ও বলা হয়। নামের শেষে এই যে বিজয়' শব্দটি আছে বলে অনেকে এটিকে 'বিজয়কাব্য' বলতে চান। তবে মঙ্গলকাব্য ধারারমতো বিজয়কাব্য নামে কোন স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়নি মধ্যযুগে। মধ্যযুগের প্রায় প্রতিটি কাব্যেই এই 'বিজয়' শব্দটি ব্যবহার করার চল ছিল। যেমন মনসামঙ্গল ধারায় মনসাবিজয়, চন্দীমঙ্গলে চন্ডিকাবিজয়, চৈতন্যজীবনীর ধারায় গৌরাঙ্গবিজয়, নাথসাহিত্যে গোরক্ষবিজয় ইত্যাদি। যেহেতু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' থেকে কোন বিজয় কাব্যের ধারার সৃষ্টি হয় নি, তাই একে 'বিজয়কাব্য' বলা যায় না।

তাহলে শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কি মহাকাব্যগোত্রীয়? বরংমহাকাব্যের অনেক বৈশিষ্ট্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এ লক্ষ্য করা যায়। মহাকাব্যগুলি মূলত বীরগাধা। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী স্থান পেয়েছে। ঘটনার প্রয়োজনে কংস, জরাসন্ধ, বাণরাজা প্রমুখদের বীরত্বের কাহিনী যুক্ত হয়েছে। ফলে প্রাচীন মহাকাব্য বা জাত মহাকাব্যের মত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বীররসাত্মক কাব্য হয়ে উঠেছি।

মহাকাব্যে যেমন হয় স্বর্গ - মর্ত্য-পাতাল বিস্তারী। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও ত্রিভুবন বিস্তৃত। মহাকাব্যের নায়ককে হতে হবে ধীরোদাত্ত। এ কাব্যের নায়ক কৃষ্ণও তাই। মহাকাব্যের নায়কোচিত সকল গুণই তার চরিত্রে বিদ্যমান। এসব দিক দিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' Epic of Art বা Literary Epic এর কাছাকাছি আসতে পেরেছে।

এবার আমরা গুনরাজ খানের নিজের লেখা শ্লোক নিয়ে বিশ্লেষন করতে চেষ্টা করবো। কাব্যের একবারে শুরুতে 'গ্রন্থের বিষয় নির্দেশ' শীর্ষক অংশে তিনি লিখছেন -

"ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।

লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া ।।"

আর কাব্যের একদম শেষে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠের ফলশ্রুতি' শীর্ষক অংশে তিনি লিখেছেন -

"অনেক আছএ সাস্ত্র ভারথ পুরানে।

টিপ্পনী

বিস্তর করিল তাহে কৃষ্ণের বাখানে ।।

সাধারণ লোক তাহা না পারে বুঝিতে ।

পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলুঁ কৃষ্ণের চরিতএ ।।"

আমরা এই দুটি অংশে উল্লেখিত একটি বিশেষ শব্দের ওপর জোর দিতে চাই, তা হল - 'পাঁচালি' তা হলে কি? 'পাঁচালী' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ 'পঞ্চালী' থেকে । এর আভিধানিক অর্থ পাঞ্চালী রীতির গীত বিশেষ । আবার ব্রতকথার পদ্যরূপকেও 'পাঁচালী' বলা হয় । এর অর্থ হল কোন বিশেষ ছন্দোরীতিতে রচিত দেবমাহাত্ম্যমূলক ব্রতকথা ।

টিপ্পনী

কৃত্তিবাসী রামায়নের নাম 'শ্রীরাম পাঁচালী' যা কিনা পয়ার ছন্দে রচিত । কাশীদাসী মহাভারত পয়ারে রচিত । মুকুন্দ চক্রবর্তী পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত গীতকে 'পাঁচালী' বা 'পাঞ্চালিকা বলেছেন । উল্লেখ্য পুরাণ পাঞ্চালী কাব্যের দুটি ভাগ নাটগিতি ও আখ্যায়িকা । উদাহরণ হিসেবে বলা যায় -

বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটগীতি আর মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় আখ্যায়িকা । পাঁচালী' শব্দটি মধ্যযুগের কাব্যে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে মূলত মধ্যযুগে পাঁচালি হিসেবে গণ্য করা হল ।পাঁচালী প্রধানত ছন্দোরীতির নাম । পরবর্তীতে এই পাঁচালী কাব্যের রূপান্তর ঘটে । তার পরিচয় পাওয়া যায় লক্ষীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ইত্যাদি লেখাতে । ঊনবিংশ শতাব্দীতে দাশরথি রায়ের পাঁচালীও পাঁচালির পরিবর্তিত রূপ ।

যাইহোক কবি'পাঁচালী' শব্দটি মূলত বিশেষ রচনা রীতিকে বোঝাতেই বোধহয় ব্যবহার করেছেন । আর তাছাড়া মালাধর বসু যখন কাব্যরচনা করেন তার সামনে কোন আর্শ রচনারীতি ছিল না । তিনিই একটি আদর্শ তৈরী করলেন ; তাঁর হাতেই বাংলা পাঁচালী কাব্যের সূত্রপাত ঘটল ।

৩.১.৭ কবিকৃতিত্ব

মালাধর বসু প্রথমে ভক্ত পরে কবি । তাই কৃষ্ণের বীরগাথা মুলক কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায় । তবে সে ভক্তি ভাগবতে বর্ণিত বৈধী ভক্তি নয় ; শাস্ত্রীয় ভক্তি । ফলে কাব্যটি হয়েছে ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবানের ঐশ্বর্য বর্ণনাত্মক মালাধর বসুর কবি কৃতিত্ব বিষয়ে আলোকপাত করতে গেলে সবার আগে চৈতন্যদেবের কথা বলতে হয় । চৈতণ্য মহাপ্রভু কবির কাব্যপাঠে বিশেষ অনুরক্ত হয়ে, কাব্যটি সম্পর্কে উচ্ছাসময় প্রশংসা করেন । কৃষ্ণ সম্পর্কে কবির লেখা 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই ছত্রটি চৈতণ্যদেবকে আপ্লুত করে । শুধু তাই নয় মালাধর বসুর কাব্যের রসাস্বাদন করে গুনমুগ্ধ মহাপ্রভু কবির বংশকেও সাদরে অঙ্গীকার করেছিলেন । এ সম্পর্কিত শ্লোক কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত'তে আছে -

"গুনরাজ খান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

তাঁহা এক বাক্যে তাঁর আছে প্রমময়।।

'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাননাথ'।

এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ।।

তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।

সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর।।"

টিপ্পনী

শ্রীচৈতন্যদেব যাঁর লেখা কাব্য পাঠে বিগলিত হন, তাঁর কবিত্ব নিশ্চয়ই উচ্চপর্যায়ের ধরে নেওয়া যায়। নইলে মহাপ্রভু কেন এত প্রশংসা করবেন। এর উত্তর কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেই দিয়েছেন। ঐ নন্দের নন্দন ." ইত্যাদি বাক্যটি মহাপ্রভুর হৃদয়কে হরণ করেছিল। সে কারণেই তিনি এত উচ্ছাস দেখিয়েছেন। চৈতন্যদেব যে আগ্রহ নিয়ে জয়দেব, বিদ্যাপতি পড়তেন মালাধর বসুর কাব্যে তার তেমন কোন আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই কৈফিয়তটুকু দিয়ে নিয়ে আমরা মালাধর বসুর কবিত্ব সম্পর্কে আলোচনায় প্রবেশ করছি। কবি যদি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করতেন, তা হলে তাঁর কবিত্ব নিয়ে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে অনুবাদ হলেও তা আসলে মোলিক রচনা। তাই কাব্যের উৎকর্ষক-অপকর্ষের দায়িত্বও কবিরই।

আমরা আগেই বলেছি একটি নিদির্ষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কবি কাব্যটি রচনা করেন।তাই যে অংশ কবির উদ্দেশ্যে পূরণের সহায়ক হতে পারে সেই অংশটুকু তিনি গ্রহণ করেছেন। বোধ করি সে কারণেই তনি মূল ভাগবতের অলংকার বাহুল্যকে বর্জন করেছেন। তবে তার অর্থ এই নয় যে, মালাধর বসুর কবিত্ব উৎকর্ষতায় উন্নীত হয়নি। কাব্যের নানা জায়গায় তাঁর কবিত্ব চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর কবিত্বের সবচেয়ে বড়দিক হল তার উচ্ছাসহীন সংযম। আবার অনেক স্থলেই তাঁর ভক্তি ভাবুকতার প্রকাশ ও ঘটেছে।

যুগ প্রয়োজনে কৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনার বর্ণনার মধ্যে দিবে ভগ্নহৃদয় বাঙালীর জীবনে আদর্শ স্থাপন করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য এ কাজ যে খবই দুরূহ তা তিনি অত্যন্ত কবিত্বময় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন -

"আকাসের তারা জদি একে একে গনি

সমুদ্রের জল জদি ঘটে পরমানি।।

পৃথুরির রেণু জদি করিএ গণন।

তবুও বলিতে নারি কৃষ্ণের করণ।।"

অর্থাৎ আকাশের তারা যদিও বা গোনা যায়, সমুদ্রের জল ঘটে করে যদিও বা পরিমান করা যায়, পৃথিবীর ধূলিকনাও বুঝি গোনা সম্ভব কিন্তু কৃষ্ণের কীর্তি বর্ণনা করা সহজ নয়।

মালাধর বসুর সময় কালে কাব্যে রসের ও রুচির বিকার ঘটালেও সমাজে তা নিন্দার হ'ত না। কেননা সে সময় তেমনি সাহিত্য রচিত হ'ত, বিশেষ করে ধামালী সাহিত্যে তো হতই। সেই সময়ে একটি বৃহৎ কাব্য রচনা করে তিনি রস ও রুচির ক্ষেত্রে যে সংযমের পরিচয় দিয়েচেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

টিপ্পনী

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহল কবির ধর্মসহিষ্ণু মনোভাব। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বৈষ্ণবদের ধর্মীয় গ্রন্থ। পরবর্তিকালে রচিত 'চৈতন্যভাগবত' এ যে পরিমাণ পরধর্ম বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে তা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এ একবারেই নেই।

বাঙালি জাতি আরো একটি কারণে মালাধর বসুর কাছে ঋনী। তা হল তাঁর কাব্যের বাঙালীয়ানা। কৃত্তিবাসের রামায়নের মতো এই কাব্যেও কবি বাঙালী জীবনের চিত্রই তুলে ধরেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাঙালী কবি মালাধের হাতে বাঙালী রূপেই চিত্রিত হয়েছেন।

৩.১.৮ ভাগবতের জনপ্রিয়তার অভাব

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের অনুবাদক হিসেবে মালাধর বসু খ্যাতি লাভ করেছেন। তবে অনুবাদের ধারায় রামায়ন ও মহাভারতের তুলনায় ভাগবতের জনপ্রিয়তা কম। কৃত্তিবাসী রামায়ন বাঙালী পাঠক সুদীর্ঘকাল তার অন্তরের ধন হিসেবেআস্বাদন করেছেন । এখনো করে চলেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সেই জনপ্রিয়তার ধারের কাছে আসতে পারেনি । এমনকি জনপ্রিয়তার নিরখে কাশীদাসী মহাভারতও অনেক এগিয়ে । অথচ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যে বৈষ্ণবপদ রচিত হয়েছে তাও বাঙালীর প্রাণেরকাব্যহয়ে উঠেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত ভাগবতের অনুবাদ বাঙালীর হৃদয়কে আকর্ষিত করেনি।

এর কারণ খুঁজতে গিয়ে বলা যায় ; 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এ রাধার কাহিণী নেই। বাঙালী রাধা-কৃষ্ণের লীলা কাহিনী শুনতে চায় কিন্তু সেখানে মালাধর বসুর কাব্যে রাধার উল্লেখ মাত্র আছে। তাও অনেকে বলেন যে রাধার উল্লেখ এতে ছিল না, রাধাপরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

বাঙালী করুনরসের অনুসারী। কিন্তু এ কাব্য বীর রসাত্মক। মধুর রসের , করুনরসের পূজারী বাঙালী তাই একাব্যের রসাস্বাদন করেন নি। তাছাড়া কাব্যটি একটি বিশেষ ধর্মসম্পদায়ের। রামায়ন, মহাভারতে যে একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার ফলে তার গ্রহণ যোগ্যতা সর্বধর্ম নির্বিশেষে। সে ক্ষেত্রেও ভাগবত পিছিয়ে।

আসলে বাংলার মাটির সচ্ছলতা এবং বাঙালী চিত্তের কোমলতার জন্য

হয়তো বাঙালী মানস বৈধী ভক্তির প্রতি উদাসীন এবং রাগানুগা ভক্তির প্রতিই তার আকর্ষন। ফলে কৃষ্ণের জীবনের গোপীলীলা বিষয়ক বৈষ্ণব পদ তার আস্বাদ্য হলেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য কাহিনীর প্রতি সে উদাসীন।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরী তা হল কৃত্তিবাস বা কাশীরামের মতো উত্তুঙ্গ কবি প্রতিভার অধিকারী মালাধর ছিলেন। রামায়ন, মহাভারতের যে সহজ কবিত্বে বাঙালী মুগ্ধ হয়েছে মালাধরের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি কবিত্বের কারণে। তিনি যতবড় ভক্ত ততবড় কবি ছিলেন না। তাঁর সমকালীন বিদ্যাপতি, বড়ুচন্ডীদাস, কৃত্তীবাস কবিত্ব শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন। মালাধরের কাব্যে কবিত্বের ও শিল্প গুনের অভাব ছিল। অন্তত্ব কৃতইবাস প্রমুখ কবির সঙ্গে তা তুলনা করবার মতো নয়। এই সমস্ত কারণে ভাগবত বাঙালী মননে চিরস্থায়ী আসন লাভ করতে পারে নি।

টিপ্পনী

৩.১.৯ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড) - অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। শ্রীকৃষ্ণবিজয় : মালাধর বসু - সম্পাদনা অমিত্রসুদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রাণা।

৩। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয় (আদি ও মধ্য) -শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

৪। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

টিপ্পনী

চতুর্থ একক

কবি বিজয়গুপ্ত : পদ্মাপুরাণ

৪.১.১ ভূমিকা

৪.১.২ উদ্দেশ্য

৪.১.৩ পরিচিতি : পদ্মাপুরাণের কবি বিজয় গুপ্ত।

৪.১.৪ বিজয়গুপ্তের চরিত্রচিত্রণ

৪.১.৫ আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

৪.১.৬ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরণে সমাজভাবনা

৪.১.৭ পদ্মাপুরণের ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারাদি।

৪.১.৮ কাব্যের রস-নিষ্পত্তি।

৪.১.৯ কবি নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের তুলনামূলক আলোচনা

৪.১.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪.১.১১ সহায়ক প্রশ্ন

টিপ্পনী

৪.১.১ ভূমিকা :

বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃতি প্রায় সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে।পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীর এক সংমিশ্রিত রূপ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা। মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীরা লোক দেবতা। এখানে গ্রাম্য অনার্য। নিম্নসম্প্রদায়ের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর প্রচার ও প্রসার। তাই মঙ্গলকাব্যে লোক জীবনের ব্যাপক প্রভাব বর্তমান।

মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রধান মঙ্গলকাব্যের পাশাপাশি শিবায়ন, শীতলামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি অসংখ্য মঙ্গলকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যে গুলির প্রচার ও বিস্তৃতি সমগ্র বাংলা জুড়ে, কখনও রাঢ় বাংলা, কখনও দক্ষিণবঙ্গে। বর্তমানে আলোচ্য মনসামঙ্গলের কাহিনী রাঢ়বঙ্গকে কেন্দ্র করে হলেও পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সকলস্থানে জনপ্রিয়তা লাভ করে ছিল। বিপ্রদাস পিপলই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অপর দিকে নারায়ণ দেব। বিজয়গুপ্ত পূর্ববঙ্গের মানুষ হলেও কাব্য রচনায় সমান দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন।

মনসামঙ্গলের কাহিনী মনসা-চন্দ্রধর-বেহুলা-সনকাকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত। মনসার পূজা পাবার আকাঙ্খা ও ছলনা। অপর দিকে চাঁদসদাগরের পৌরুষ দৃঢ় চরিত্র এবং শৈব উপাসক

হিসাবে তার একাগ্রতা। বেহুলার সতীত্ব সন্দেহাতীত। সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার কাব্যকে উৎকৃষ্ট করুণ রসাশ্রিত করে তুলেছে। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের পাঁচখানা অনুলিখিত পুঁথি বরিশালের গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে পুথিগুলিতে লিপিকরদের দ্বারা কিছু ঘটনা পরিবর্তন ও সংযোজন থাকলেও মূলকাহিনী একই। এছাড়া গায়েনদের হাতেও পালাগুলি অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে যেত।

টিপ্পনী

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি। মঙ্গলকাব্যের বিশেষ করে মনসামঙ্গলের সর্বগ্রাসী জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। আজো বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সমানভাবে জনপ্রিয়। মনসার পূজা ও ভাসানকে কেন্দ্র করে মঙ্গলগানের আসর ও নানাকরম চিত্তাকর্ষ অনুষ্ঠান সহযোগে উৎযাপন চোখে পড়ে। এছাড়া মনসার পূজা উপলক্ষে ছাগ, পায়রা প্রভৃতি বলিদান ও সমানভাবে জনপ্রিয়। মনসা শুধু সর্পদেবী নন, সর্পভয় নিরাকরণের পাশাপাশি ব্যক্তিমানুষের মনস্কামনাও পূর্ণ করেন। তাই মন্দিরে মানত করার প্রবণতাও দেখা যায়। সর্বোপরি একথা বলা যায় মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলার মাটির সম্পদ। মাটির কাছাকাছি মানুষের জীবন নির্ভর করে গড়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্য যা ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে সুদীর্ঘকাল অতিক্রম করে বর্তমানকালেও স্বমহিমায় ভাস্বর।

৪.১.২ উদ্দেশ্য:

মঙ্গলকাব্য আমাদের সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি নিতান্ত সাধারণ মানুষ থেকে রাজরাজড়াদের ভূমিকা দেখা যায়। তাদের আচার-আচরণ, সংস্কার, অনুষ্ঠান, জীবন মানসের ছবিগুলিও স্থান পেয়েছে। আর এই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আছে অনার্য দেবদেবীর সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীর মিলন সাধনের প্রকৃয়া। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা সমাজের নিচুতলার মানুষের কাছে পূজা প্রচার করলেন। সাধারণ মানুষ তাদের মতো করে তাদের প্রাণের দেবতা তথা রক্ষাকর্তা কর্ত্রীকে অবলম্বন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখল। বাঙলার এক বিশেষ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাতে মঙ্গলকাব্যের তথা দেবদেবীদের উৎপত্তি। যার মধ্যে বাক্ষণ্য সংস্কৃতি ছাড়াও অনার্য সংস্কৃতি, জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের এক মিশ্রণ লক্ষিত হয়। শেষে একথা বলা যায়-মঙ্গলকাব্যের ফলে আমরা মধ্যযুগের ইতিহাসকে জানতে পারি। যে ইতিহাস শুধু ধর্মের নয়, রাজনৈতিক জীবন ও সমাজজীবনের। মনসামঙ্গলেও তৎকালীন জীবনের ইতিহাসকে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষের সুখ দুখ:-আশা আকাঙ্খাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন বিজয়গুপ্ত। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিকতা বনাম মৌলিকতা' গ্রন্থে মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে বললেন-'মঙ্গলকাব্যগুলি ধর্মীয় বিচারে দেবদেবীর মহিমাজ্ঞাপক কাহিনী; কিন্তু ইতিহাসের বিচারে মধ্যযুগীয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার পটভূমিতে আত্মরক্ষার পুরাণ।'

কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ

৪.১.৩ পদ্মাপুরাণের কবি বিজয়গুপ্ত:

চৈতন্যপূর্ব যুগের মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্ত। নারায়ণ দেবের পরেই বিজয় গুপ্তের

কাব্যের স্থান। কাব্যমধ্যে পাওয়া তথ্যানুযায়ী ফুল্লশ্রী গ্রামে বিজয়গুপ্তের বাসস্থান। এই গৈলাফুল্লশ্রী গ্রাম বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। পদ্মাপুরাণের শ্লোকে তার উল্লেখ-

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পুবে ঘন্টেশ্বর,
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পন্ডিত নগর।
চারি বেদধারী তথা বাক্ষণ সকল।
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল।।
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের শূর।
অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর।।
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়।।

টিপ্পনী

বৈদ্যবংশের পান্ডিত্যের খ্যাতি আজো ফুল্লশ্রী গ্রামে বর্তমান। বিজয়গুপ্তের নিজের বংশ লুপ্ত হলেও আত্মীয়বর্গের বংশধরেরা সেখানে বসবাস করে চলেছে।

বিজয়গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল বিষয়ক শ্লোক ইতিহাস নির্ভর। এই ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী গ্রন্থ সম্পর্কে ও তৎকালীন রাজ্যশাসন সম্পর্কে তথ্যাদি উঠে আসে। মনসার জন্মপালার বিভিন্ন পাঠ থেকে জানা যায়-

'ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক।।
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহু বলে রাজা শামিল পৃথিবী।।
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতোয়াবাদ বাঙ্গারোড়া তক্‌সিত।।'

'ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক'-ভঙ্গিতে গ্রন্থরচনার কাল- ১৪০৬ শক অর্থাৎ ১৪৮৪ খীষ্টাব্দ। এই শ্লোক হিসাবে সুলতান হুসেন সাহা এই ঐতিহাসিক তথ্যের মিল পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়াও আরো দৃষ্টিপাঠ পাওয়া যাচ্ছে। শেষ পাঠে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে সে সম্পর্কে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য-

'শেষোক্ত পদটি হইতে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খীষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই সময় হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান

ছিলেন। অতএব এই সময়টিই বিজয় গুপ্তের কাব্যরচনার কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।'

পদ্মাপুরাণের কবি বিজয় গুপ্ত ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাসের রবিবার মনসা পঞ্চমীতে দেবীর স্বপ্নাদেশে তিনি নানাছন্দে, নানা রাগে পাঁচালী রচনা গীত রচনার নির্দেশ পেলেন।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরণের ভণিতা সম্পর্কে পন্ডিত মহলে বিতর্ক দেখা দেয়। কাব্য লিপিকর ও গায়েনদের হাতে বহু কিছু সংযোজিত ও বিয়োজিত হয়েছে। এছাড়া লিপিকররা নিজেদের মত করে কিছু বিষয় বদলে দিয়েছেন যা থেকে ভ্রান্তির উৎপত্তি। পদ্মাপুরাণের ভণিতা সম্পর্কে সুকুমার সেন জানালেন-

'কতকগুলিতে ভণিতা আছে-''বিজয়'', ''বিজয় গুপ্ত'', ''বেদ্যবিজয় গুপ্ত''। একটি গানে পাই ''দ্বিজ রামপ্রসাদ''। অন্যত্র হয় ভণিতা নাই, নয় বিজয়গুপ্তের ভণিতা। বার দুইয়েক ''কবি চন্দ্রপতি''র এবং একবার ''শ্রীপুরুষোত্তম''-এর। কোন কোন স্থানে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভণিতা প্রক্ষিপ্ত।

টিপ্পনী

৪.১.৪ বিজয়গুপ্তের চরিত্র-চিত্রণ :

কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপূরাণ গ্রন্থে চরিত্রগুলি জীবন্ত। শিব, চন্ডী, মনসা প্রমুখ দেবদেবী চরিত্রের পাশাপাশি-চন্দ্রধর, সনকা, বেহুলা, লক্ষীন্দরেরাও প্রাণবন্ত।

শিব চরিত্রটি মধ্যযুগের সমান বাস্তবতা নির্ভর করে এঁকেছেন। গৃহে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার বহুগামীতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজে বহুবিবাহের ধারণাটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তার ভাঁড়ামি বা হাস্য রসরসিকতার দিকটিও বেশ উপভোগ্য। ডোম রমণীর কাছে যাওয়ার পূর্বে ষাঁড়ের বর্ণনা, শিবের লাফ দিয়ে পিঠে ওঠা হাস্যরসের উদ্রেক করে। দেবীর ডোমনী রূপ ধরে শিবের সঙ্গে কথোপকথন অংশ ছাড়া ও পদ্মার বিবাহ অংশে শিবের উক্তি-

হাসি বোলে শূলপাণি আইয় ভাড়াইতে জানি
লেংগটা হইয়া মধ্যে দাঁড়াইব।।
দেখিয়া আমার ঠান আইয়র উড়িব প্রাণ
লজ্জা পাইয়া যাবে পলাইয়া।।

মদন পীড়িত মহাদেবকে আমরা পাচ্ছি, যে ডোমনিকে বলে ধরতে চায়-

'মদনে পীড়িত শিব হাসে কুতুহলে।
শূন্য ঘরে ডোমনিকে ধরিতে চাহে বলে।।'

পরনারীর ঘরে বাঙালীর রন্ধন ভোজনের কথা উঠে আসে-

রন্ধন করিল দেবী আপনার মন।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন হইল তখন।।

বাঙালী পরিবারের দারিদ্রের চিত্রটিও বিজয় গুপ্তের গ্রন্থে শিবচরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়েছেন-

বুড়া বয়সে অপযশ ঘরে নাহি ভাত।
আপনা পুষিতে নার বোল ত্রিজগতের নাথ।।

শিব যেন আমাদের সংসারের দোষ-গুণের সমাহারে হাস্য-রসিক পত্নী-পুত্র নিয়ে গৃহী মানুষের প্রতিনিধি।

দেবী চন্ডীর যে পরিচয় কাব্য মধ্যে পাচ্ছি তাতে বুদ্ধিমতী পত্নী-সন্তান স্নেহ বৎসল জননী বলেই মনে হয়। সংসার চালানোর মত সকল সক্ষমতা তার মধ্যে আছে। নাগমহীন শিবকে তিনি পরিচালনা করেছেন। মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারীতাকে চন্ডী মেনে নেন নি। ছলনা করে শিবের অন্যত্র গমনকে যেমন হাতে ধরেছেন তেমনি তার বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ দেখা যায়। তৎকালে পুরুষে বহু বিবাহ ছাড়াও অন্য নারী গৃহে গমন সম্পর্কে চন্ডী সচেতন ছিলেন । তাই শিবের চঞ্চল অবস্থা বুঝে চন্ডীর জিজ্ঞাসা-

'আজ কেনে তোমার মন না বুজি গোসাই।
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবা কোন ঠাই।।
কার্য্যের গৌরবে যদি যা ও দৈব্যাতি।
যথাতথা যাও আমি যাই সংহতি।। (পৃ-১৪)

টিপ্পনী

স্বামীর ছলনা ধরতে চন্ডী গৃহের বাইরে পাটনী সাজতে দ্বিধা করেনি।

মধ্যযুগে সপত্নী সমস্যাটি ও সামনে উঠে আসে। নিজকণ্যা গৃহে আসলেও পরিচয় না জানার কারণে মনসাকে সপত্নী ভেবে গৃহত্যাগের জন্য যা করার তা করতে দেখা যায়। স্বামী মাঝে মাঝে গৃহ ছাড়া হয়ে যায় সন্তান-সন্ততি নিয়ে স্ত্রীর অসহায় অবস্থা ও স্বামী সম্পর্কে বাস্তব কথা কাব্যে-

'আমার দুঃখের কথা কহিতে বিস্তর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর।।
পাগলের বেশে ফিরে ঘরে নাহি মন।
বুড়াকালে অপযশ হাসে সর্ব্বজন।।
ঘরের স্বামী হইয়া করে পরদার কেলি।
সহিতে না পারি দু:খে দিলাম বড় গালি।। পৃ-২৮

শিব 'পুষ্পের করন্ডী' নিয়ে বাড়ির চালের উপরে রাখলে দেবী তা হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে পরমা সুন্দরী কণ্যার সন্ধান পাওয়া যায়। তা দেখে দেবী বললেন-

'ঘরের নারী ভাল না বাসে পরনারী সাধ।
পাকা দাড়িতে লাজ নাহি একি পরমাদ।।'

শিব কণ্যা বেহুলা সম্পর্কে পূর্বে কোন কিছু চন্ডীকে জানায়নি। তাই চন্ডী সপত্নী ভেবে-

'চুলে মুখে পেটে পিষ্টে মা (৭) র ঘরেকাতা।
বিপরীত বোলে পদ্মা মনে লাগে বেথা।।
নিঠুর হইয়া মারে চন্ডী প্রাণে সইতে নারে।
বাপ বাপ বলি পদ্মা ডাকে উচ্চৈর স্বরে।।'

পায়ে হাতে ধরলেও পদ্মাবতীর কোন কথা তার বিশ্বাস করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত গঙ্গার সঙ্গেও তার কথোপকথন দেখা যায়। অবশেষে পদ্মার বিবাহ ও অন্যত্র স্থান দেখা যায়।

টিপ্পনী

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে নারদ, জয়ৎকারু মুনি, ও অন্যন্য দেব-দেবী চরিত্র সেভাবে পরিস্ফুট নয়। শিব কণ্যা মনসা চরিত্রই কাব্যের আদ্যপান্ত বিষয় হয়ে উঠেছে। মনসার জন্ম বৃত্তান্ত যেমন দেব সমাজ বহির্ভূত। ছোট থেকেই পিতা-মাতার স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিতা নারী। দেব সমাজে তার স্থান হয়নি তবে পূজা প্রচারের জন্য মর্ত্যলোকে তার লীলা দেখতে পাই। পূজা প্রচার সূত্রেই চন্দ্রধরের সঙ্গে বিরোধ। তার পুত্রদের হত্যা, বেহুলার সঙ্গে ছলনা, ভক্ত সনকাকেও দু:খ প্রদান। পিতা-মাতার গৃহে মনসার স্থান হয়নি এমনকি পতিগৃহেও তার ঠাঁই মেলেনি। তবে মনসা প্রথম থেকে দেখি ভয়হীনা। মুনির (হরৎকারু) সঙ্গে বিবাদকালে তার ক্রোধের ছবি ফুটে ওঠে-

''মুনির ক্রোধে মনসার চিত্তে নাহি ডর।
ক্রুদ্ধ হইয়া তখনে বলিলা মুনিবর।।
বাক্ষণের নারী হইয়া নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
ভাঙ্গড়ার ঝি তুই কিসে অপমান।।''

এ সকল কথা শুনে ক্রুদ্ধমনা মনসা তার বিক্রম প্রকাশের কথা বলে-

'এত বলি বিষহরি চাহে মুনির ভিতে।
ঢলিয়া পড়িল মুনি পদ্মার সাক্ষাতে।।'

এর পরই স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটেছে।

নেতার সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে নরলোকে কিভাবে পূজা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করেছে। রাখালদের মধ্য দিয়ে প্রথম পূজা পাওয়া শুরু করলেন। এই প্রথম পূজা পাওয়ার মধ্যেও আছে ছলনা। সনকাকে প্রথম থেকেই পদ্মাবতী পূজা করতে দেখা যায়। কিন্তু (চান্দ) চন্দ্রধর ঘরে স্ত্রী সনকার মনসা পূজার সংবাদ পেয়ে-

'বার্তা পাইয়া চান্দ হেতাল লইযা হাতে।
লড় দিয়া পুরীর মধ্যে চলিল ত্বরিতে।।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে ঘটের উপরে।
খন্ড খন্ড হইয়া পড়ে ঘরের ভিতরে।। (১৪৮)

শৈব-উপাসক চন্দ্রধরের সঙ্গে মনসার বিরোধের সূত্রপাত। মনসা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য-নন্দন বাড়ী বিনষ্ট করলেন। একে একে বৃক্ষশাখা কাটার মত চন্দ্রধরকে দুর্বল করতে থাকলেন পদ্মাবতী। শঙ্কর গাড়রী নিধন, একে একে ছয়পুত্রের জীবন হরণ, চোদ্দডিঙা নিমজন, অবশেষে বাসরঘরে প্রিয়পুত্র লক্ষীন্দরের জীবন হরণ। চম্পক নগরীকে শোক সন্তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত করেছেন।

চাঁদ সওদাগর তার পূজা না করার জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়েছে। তার কাছে পূজা পেলেই পৃথিবীতে মনসা পূজা প্রচার হবে। এ জন্যই চাঁদের উপরে তার এ ভয়ঙ্কর কষাঘাত। সনকার পুত্র বিয়োগে হাহাকার, বেহুলার আর্তনাদ, চন্দ্রধরের দীর্ঘনি:শ্বাস দেবী মনসাকে বিচলিত করতে পারেনি। নারী হয়েও তাঁর কঠোর মনোভাব দেখে মনে হয় পূর্ববর্তী দেব সমাজ বহির্ভূত জনিত ও পিতা-মাতার স্নেহমায়া বর্জিত কারণের ফসল। দেবাদিদেব মহাদেবের কড়া নির্দেশেই সকলের জীবন ও সপ্তডিঙা ফিরিয়ে দিতে রাণী হয়েছেন। তবে চন্দ্রধরের কাছ থেকে পূজা নিতে ভোলেননি।

চন্দ্রধর চরিত্র অন্যায়, চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো-মনুষত্ব বোধের জাগরণ। দেবী মনসার পূজা দিতে অস্বীকার করেছেন। তিনি শৈবভক্ত তাই মনসার পূজা মনে প্রাণে কোনভাবেই মানতে পারেননি। একে একে চক্রান্তকারী মনসার কঠোর শাস্তি জীবনে নেমে আসলেও কোনভাবে পূজা দিতে সম্মত হতে দেখা যায় না। তাঁর পূজা না দেওয়ায় চোদ্দডিঙা ডুবিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পদ্মাবতী। ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে -

'সর্ব্বলোকে বলে সাধু পুন বিষহরি।
তবে আমরা সবে প্রাণে নাহি মরি।।'

টিপ্পনী

এ কথা শুনে সদাগর প্রত্যুত্তরে-

'শিব সহায়ে থাকিতে কাণির কিবা ডর।।'

কিন্তু বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে তেরটি নৌকার সলিল প্রাপ্তির পর চাঁদের যে বর্ণনা তা নিয়তি তাড়িত সাধারণ ব্যবসায়ীর চিত্র-

'তেরখানা ডিঙা জলে হইলেন তল।
কান্দিয়া চান্দো বানিয়া হইল বিকল।।'

একে একে ছয় পুত্রের মৃত্যু মা সনকাকে যেমন দু:খ দিয়েছে নিয়তি চন্দ্রধরও তেমনি দগ্ধ পুত্রশোকে। তার শেষ সম্বল লক্ষিন্দরকেও প্রাণ হারাতে হয়েছে চাঁদ-মনসার বিবাদে। বেহুলার কৃচ্ছসাধনায় সকল পুত্র, সম্পদ ফিরে পেয়েছেন চাঁদ কিন্তু তাকে বিষহরি পূজা করতে হবে। তখন চন্দ্রধর জানালেন-

'যেই হস্তে পূজি আমি শিবের চরণ।
সেই হস্তে পদ্মার পূজা করিব কেমন।।'

অবশেষে পুত্র-পুত্রবধূ-সনকা মুকাই প্রভৃতি পন্ডিতদের কথা কর্ণকুহারে প্রবেশ করেছে এবং দেবীচন্ডী তাকে সাক্ষাৎ দিয়ে তাকে চন্ডী-মনসা একই তা বোঝানোয় সাধারণ ছাপোষা বাঙালীর মত-

'আমারে করহ কৃপা বিষহরি মারে।
গোঁফ দাড়ি কাটিয়া দিব তোয়া পায়।।'

শেষে দেবী মনসার চরণ শরণ করে দিনাতিপাত করেছেন তা বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলে-

'ধন পাইল জন পাইল আর পাইল নাও।
দিবানিশি করে স্তুতি মনসার পা ও।।
এই মতে পূজা যদি করিলা সদাগর।
ধনে পুত্রে সুখে রইলা আপনার ঘর।।'

অন্যান্য মনসামঙ্গলের তুলনায় চন্দ্রধর চরিত্র যেন অনেকটাই চারিত্রিক দৃঢ়তা থেকে সরে এসেছেন। কঠোর অনমনীয় চরিত্রে যে চন্দ্রধরকে আমরা দেখি তা এখানে কিছুটা হলেও ম্লান।

বেহুলা পতিপরায়না সতীসাধ্বী রমনী। কঠিন সাধনার মধ্য দিয়ে বেহুলা সার্থকতার কিনারে পৌঁচেছে। শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন-

'বেহুলার সাধনা স্বর্গ ও মর্ত্যের ব্যবধান ঘুচাইয়া ক্ষণভঙ্গুর মর্ত্যের ধূলিকণাকে আমরা শাশ্বত জীবনের রসে সিঞ্চিত করিয়া মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছে।'

সনকা বা সোনাই শোক সন্তপ্ত জননী। প্রিয় পুত্র লখাইর মৃত্যুতে তার হৃদয় বিদারী হাহাকার-

'বাসরে ঢলিল লখাই শুনিয়া সোনকা।
আহা পুত্র বলি কান্দে বুকে হানে ঘা।।
সোনকা ক্রন্দন করে ভূমে দিয়া গড়ি।'

টিপ্পনী

পুত্রের এ মৃত্যু সোনকার কাছে কাম্য নয়। দেবীকে পূজা করেও প্রিয় সন্তানকে রক্ষা করতে ব্যর্থ। পুত্রের পূর্বে সে মৃত্যু কামনা করেছে যা পিতামাতার কাছে স্বাভাবিক। বিজয়গুপ্তের ভাষায়-

''আমি মরিলে বাপু কে দিব আগুনি।
তুমি বিনে দিব নারে মুঁই অভাগিনী।।''

এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলি মঙ্গলকাব্যের ধারা বজায় রেখে অঙ্কন করেছেন।

৪.১.৫ আত্মমূল্যায়ণধর্মী প্রশ্ন :

০১. বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের রচনাকাল বিষয়ে আলোচনা কর।

০২. দ্বন্দ্ব জর্জরিত মনসা চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

০৩. বিজয়গুপ্ত সৃষ্ট চাঁদ সদাগর চরিত্রের পরিচয় দাও।

০৪. বিজয়গুপ্তের কাব্যে অতিসাধারণ মানুষের যে ছবি উঠে এসেছেন তার বর্ণনা প্রদান কর।

৪.১.৬ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে সমাজভাবনা :

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মীয় চেতনা ও সমাজ ভাবনা দিকগুলি উঠে এসেছে। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ কাব্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মনসার জন্ম, চন্ডীর সহিত শিবের সাক্ষাৎ ও বিবাদ, মনসাকে চন্ডীর দর্শন ও প্রহার প্রভৃতি পালায় দেবদেবীদের কেন্দ্র করে কাহিনী-চরিত হলেও মধ্যযুগের সমাজজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।

তৎকালে সমাজে ডোম, সুবর্ণবণিক, জেলে, বৈদ্য, পাঠনী, তাঁতি, চাষী সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। বাড়িতে স্ত্রী পুত্র থাকা সত্ত্বেও পরদার গ্রহণের প্রসঙ্গ বিজয়গুপ্তের কাব্যে লভ্য। ভাঙ্গ, ধুতুরা, আফিন সেবন করে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ার যেমন আছে তেমনি অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীদের গৃহের বাইরে জীবিকার কারণে বহির্গমনের দৃশ্য স্থান পেয়েছে বিজয়গুপ্তের কাব্যে। সতীন সমস্যা ও সে কালে চরম আকার ধারণ করে ছিল তা মনসা ও চন্ডীর সম্পর্কের মধ্যে দেখা যায়। সতিন ভেবে পদ্মার উপরে চন্ডীর আক্রোশ-

'কোপে ব্যাকুলি দেবী বোলে অহংকারে।
চুলে ধরি পদ্মারে মারে আর বাড়ে।।

চন্ডীর প্রহারে পদ্মার শরীর জর্জর।
কহিতে না পারে করে থর থর।।'

এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ সেকালেও ছিল।যেমন-জরৎকারু-মনসার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটনা।

সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে ছিল এক ধর্মীয় বাতাবরণ।হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের কথা আছে।কাজির পুত্রের উৎশৃঙ্খলা, অপর ধর্মের প্রতি নিন্দার কথা বিজয়গুপ্তের কাব্যে-

টিপ্পনী

'একদিন হলি তথায়ে (অ) শুভ লক্ষণ।
হাসান হুসেন দুই কাজির নন্দন।।
মহা দুরন্ত তারা কোন ভয় নাই।
ধর্ম্ম কর্ম্ম বেদ নিন্দা করে ঠাই ঠাই।।
আফিঙ্গ খাইয়া তারা আগমন হাতে পায়ে।
তার পাছে আপনার বেশ বানায়ে।।'

রাজ অঙ্গনে নাচ, গান, বাজ্যকারদের আনাগোনা ছিল।নটীদের নৃত্যগান এবং সেখানে সম্ভ্রান্ত পুরুষদের যাতায়াত ছিল-

'গীত গাহে মহাদেবী রাগে নহে ঢিল।
আলাপেন গীত যেন বসন্ত কোকিল।।
গীত শুনিয়া ছন্দর মজিলেক মন।
নটীর দিগে চান্দে চাহে ঘন ঘন।।'

রন্ধন, ভোজনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাঙালীয়ানার পরিচয় বহন করছে।পঞ্চাশ ব্যঞ্জন এবং ভোজন অন্তিমে-

'কর্পূর তাম্বুল খাইয়া করিল শয়ন।'

'পান গুয়া খাইয়া রাজা গড়িয়া গেল ভোলি।'

বাঙালী জীবন নির্ভর।সনকার গর্ভধারণ-তার বর্ণনা ও সামাজিক ক্রিয়াগুলি আমাদের সমাজ সঞ্জাত-

একমাস গর্ভ হইল সোনকা সোন্দরী
দুই মাসের কালে হইল লোক জানাজানি।।
ষষ্ঠী পোজে সোনকা ষষ্ঠ মাস পাইয়া
দেব পূজা করে সোনাই আনন্দিত হইয়া।।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আমাদের সমাজের জাতক্রিয়ার বর্ণনা পাচ্ছি।লখীন্দরের জন্মের ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা, সাতদিনে উঠানি, ছয় মাসে -

এক দুই তিন চারি ছয় মাস হইল।
অন্নপ্রাশন হেতু কৌতুক জন্মিল।।

নান্দীমুখ যত্নাদি করে 'লখিন্দর' নাম রাখা হল। জাতকের পাঁচ বছরে-

পঞ্চ বৎসরের যদি লখিন্দর হইল।
হাতেখড়ি কর্ণভেদ এক কালেতে কইল।।

বিবাহের ক্ষেত্রে পাঁজি বিচার করে বিবাহের শুভ দিন স্থির। জাতক-জাতিকার রাশি, নক্ষত্র বিচার করে বিবাহের সম্পর্কে সম্মতিপ্রদান। বিবাহে সকল আচার লক্ষিত হয় যেমন- নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, স্নান করানো, পূর্ণঘট স্থাপন। গীতবাদ্য সহযোগে স্ত্রী আচার-

নারীগণে হুলাহুলি দিল হয়ে হয়ে।
চৌদিকে নারীগণে মঙ্গল যে গায়।।

খেউর কর্ম শেষে লখিন্দরকে বরের বেশে সাজান হল। বরকে বরণ করা, নারীগণের পতিনিন্দা প্রভৃতি চিত্র পাচ্ছি।

বাংলার সমাজ-রাজনীতির কথা যেমন পদ্মাপুরাণে পাচ্ছি তেমনি খাদ্যরসিক বাঙালীর বিস্তৃত বর্ণনাও দুর্লভ নয়। সনকার সাধ-ভক্ষণের ক্ষেত্রে রন্ধনের নিরামিষ-আমিষ নিয়ে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের কথা জানতে পারা যায়। শাক, শুক্তা, বড়া, 'মুগসুগ', নারিকেল দিয়ে 'ঝিঙ্গা', 'ঢেকির কড়ি দিয়া রান্ধে কাঁঠাল আটি।' খেসারির ডাল, কাঁঠালের মুছি, এছাড়া-

'বড় বড় সওল মৎস্য রাঙ্গা হইছে কোল।
কত তৈলেত ভাজে কত রান্ধে ঝোল।।
ছোট ছোট চোদ্দ মৎস্যের ফালাইয়া মুড়।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক নন্দন বারিব থোড়।।'

লাউ, কচু, 'চেঙ্গপোড়া', কলার মূল, কই মাছ, শোলের পনা প্রভৃতি খুব সাধারণ বাঙালীর খাদ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত ব্যঞ্জন উঠে এসেছে। মাছ, মাংসের পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানোর জন্য শেষে মিষ্টি জাতীয় দ্রব্যের কথা-

খিড় খিড়িয়া রান্ধে দুগ্ধের পঞ্চ মিঠা।
গুড় চিনি দিয়া রান্ধে খাইতে লাগে মিঠা।।

এভাবেই বিজয়গুপ্ত তার পদ্মাপুরাণে সমাজের নানা দিক গুলি তুলে ধরে মধ্যযুগের সমাজ-পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানচর্চার দিকটিকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সমাজ ভাবনার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় অভিজিৎ বাবুর বক্তব্যে-

'বিজয় গুপ্তের কাহিনীতে সমকালীন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে চৈতন্যপূর্ব পাঠান রাজত্বের ভৌগলিক , ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ইঙ্গিত মেলে। সামন্তদের প্রতাপ, মুসলমান অত্যাচার, ধনীর বিলাসিতা, জমিদারী সংঘর্ষ, রাখালিয়া সমাজ, বেহুলার রান্নাবান্না, পাত্র নির্বাচন, বিবাহ-অনুষ্ঠান, আরো অনেক কিছুই বিজয়গুপ্তের কাব্যে ভীড় করে। এটি বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের দলিল হয়ে উঠেছে।'

টিপ্পনী

৪.১.৭ কাব্যভাষা, ছন্দ, প্রবাদ-প্রবচন :

ভাষা-ছন্দের ক্ষেত্রে অন্যান্য কবিদের তুলনায় বিজয় গুপ্তের কাব্য অনেকটা শিথিলতা যুক্ত। ছন্দের দিক দিয়ে এই শিথিলতা বেশী করে দেখা যায়। পদ্মাপুরণে প্রবাদ প্রবচন যেমন আছে, তেমনি সে সময়ের আটপৌরে শব্দগুলিও কাব্যাঙ্গনে উঠে এসেছে। বিজয় গুপ্তের পান্ডিত্য সম্পর্কে শ্রী জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন-

'কবি বিজয় গুপ্তের রচনায় পন্ডিত্যের পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম। ছন্দের বন্ধন কোন কোন ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়া উহা আভিধানিক পরিভাষানুসারে সর্বাংশে উচ্চাঙ্গ কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু স্বভাব- কবিত্বের সৌন্দর্যসম্ভারে তাহা ভরপুর। বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় এবং রচনার সরসতায় উহা অধিকতর প্রাণস্পর্শী হইয়াছে।'

টিপ্পনী

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরণে সমাজ নির্ভর প্রবাদ-প্রবচন স্থান পেয়েছে-

- যাহার নমক খাই তাই তাহার করি কাজ।
- যমের অধিকার জান সংসার বিদিত।
- স্ত্রী হইয়া তোমার বা বড়াই।
  শৃগাল হইয়া কেন সিংহেরে লড়াই।।
- অশুভ নিকটে আইলে নানা দৈব লাগে।
- বিধাতার নির্বন্ধ কভু নাহি লড়ে।
- দৈবের নির্বন্ধ কতো খন্ডান না যায়।
- সর্পঘাত হইলে অগ্নিতে না পুড়ি।
- স্বামী অভাবে নারী জীবন কুৎসিত।

এ রকম অসংখ্য প্রবাদ প্রবচন লক্ষ্য করা যায়।

পদ্মাপুরণে সমকালীন যুগের মানুষের মুখের ভাষা কাব্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এগুলি আটপৌরে ভাষার লক্ষণ-যেমন-

- উদরে চিন চিন করে কাকালি ছিড়িয়া পড়ে
  কিবা বর দিল বিষহরি।

- এ খাটাল হতে সোনাই ও খাটালে যারে।
  মধ্য খাটালে সোনাই গড়াগড়ি বায়ে।।

- আগা গোড়া সমান নাহি দেখি ফেরি বেকা।
  তিন চারি গোটে বেচিতে পারি টেকা।।

টিপ্পনী

বিজয়গুপ্তের কাব্যে সমকালের সমাজে প্রচলিত বাংলা ভাষার শব্দ ছাড়াও আরবী-ফার্সী ও অন্যান্য শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে-যেমন-ইহার, প্যাদা, আল্লা, আফিঙ্গ, কাজি, মুছাপের, কিতাব, কুত্তা, পেয়াদা, খিলাইয়া, সুলতান, সাইদ, মুলুক, কোরান, গোস্ত, নমক, জোক প্রভৃতি অজস্র শব্দ।

নারীদের মুখের কথা ও বিজয় গুপ্ত তার কাব্যের কোন কোন স্থানে তুলে ধরেছেন, বিশেষ করে পতিনিন্দা পর্যায়ে-

■ তাহারে দেখিয়া মোর গায়ে লাগে সলি।
লখাইর পায়ে কাটিয়া তাহার দেই বলি।।
এ স্বামী কাজ নাই দেশে মাগি খাই।
মাগিয়া খাইতে আমি লখাইর দেশে যাই।।

■ আর আইয় বলে চিত্তে হেন বাসি।
পাট বস্ত্র হইয়া লখাইরে পরশি।।

■ কে মোরে বলে বুড়ি ধরিয়া মারম কিল কুড়ি
চোপাড়ে চাপড়ে ভাঙ্গম গাল।

■ বেউলা বলেন ভাই বাহিরে কেন বৈস।
দুয়ার মেলিয়া দেই কর মধে(্য) আইস।।

■ প্রাণ ফাটিয়া যায়ে বিদরয়ে বুক।
দুঃখ পাসরিব আমি দেখিয়া কার মুখ।।
দেখিয়া স্বামীর রূপ মনে করিলাম আশ।
না পুরিল মনের সাধ বিধি করিল নৈরাশ।।

ছন্দ-অলংকার :

বিজয় গুপ্ত মঙ্গলকাব্যের ধারাকে বজায় রেখে কাব্য রচনা করলেন। ছন্দের ক্ষেত্রে পয়ার লাচাড়ীকে প্রাধান্য দিয়েও নতুনত্বের সূত্রপাত করলেন যা আধুনিক কালের স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতিরূপ-

'প্রেতের মনে শ্মশানে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি।।
আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূলে লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড় খাউক যেমন ভান্ডাল মোরে।।'

একাবলী ছন্দ রচনায় মঙ্গলকাব্যের শেষ প্রতিভাধর কবি ভারত চন্দ্রের একাবলীর রূপ খুঁজে পাওয়া যায়-

জগত মোহন শিবের নাচ।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ।।
রঙে নেহারিয়া গৌরীর মুখ।
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক।।

অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিজয়গুপ্ত, উপমা, ব্যাজস্তুতি, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি। উপমা প্রয়োগের উদাহরণ-

টিপ্পনী

জনম দু:খিনী আমি দু:খে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল।।
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে।।

এই ধরনের উপমা বিজয়গুপ্তের পূর্বে ও পরে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যোগ্য পাত্র-পাত্রীর বর্ণনায় বিজয় গুপ্ত-

বেহুলা যেন কণ্যা লাখাই তেন দারা (মত)।
পাতিল জুগিয়া যেন কুমারে গড়ে শরা।

ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের ক্ষেত্রে কবির স্বাভাবিক রসবোধ থেকে তা স্পষ্ট। শিবের সন্ধানে চন্ডী, সেখানে খেয়াপারাপার করছে এক ডোমনী। সেখানকার চিত্র ও সাক্ষাৎকার-

'তোমার মত সই আমি বড় ভাগ্যে পাই।
আমার দু:খের কথা তোমাকে জানাই।।
চন্ডী বলে সখী মোর দু:খের নাহি ওর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর।।'

৪.১.৮ কাব্যের রসনিষ্পত্তি :

মনসামঙ্গলের জনপ্রিয় কবি বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' মর্তের মানব-মানবীর জীবন রসে সিক্ত। দেব-দেবী চরিত্র ও মর্তের নর-নারী চরিত্রের মত প্রেম-প্রীতি আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে এক হয়ে উঠেছে। দেবতা ও মানুষের বিরোধে দেবতা যেন দেবত্ব খুইয়ে বসেছে। সেখানে চক্রান্ত-ক্রূরতা এবং মনসার পূজা পাওয়ার ইচ্ছা এমন স্তরে পৌঁচেছে যে এই কাব্য-

'মনসামঙ্গল কাব্য করুণরস প্রধান। বিভিন্ন রসের সমাবেশে এই কাব্যখানি রচিত হইলেও করুণরসই ইহার মূল সুর।' (শ্রী জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত, কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ) সনকা, বেহুলা, সুমিত্রার ক্রন্দনে কাব্য করুণ রসে সিক্ত।

বিজয়গুপ্তের কাব্যে রঙ্গ-ব্যঙ্গ যুক্ত হাস্যরসের দিকটিও ফুটে উঠেছে। শিবের চরিত্রটি যেন বেশী করে রঙ্গ ব্যঙ্গের দিকে ধাবমান। শিবের বৃষের সাজসজ্জা বেশ হাস্যকর-

'সর্বাঙ্গে তুলিয়া দিল মাণিক্য রতন।
গলায়ে বান্দিল ঘন্টা করে ঠন ঠন।।

বুকে পীষ্টে বান্দিলেক সোদরি ঘাগর।
লেজেতে বান্দিল শ্বেত দিগল চামর।।'

এছাড়া এই বৃষকে অবসম্বন করে শিবের সরযুতে যাত্রা ও বেশ কৌতুকরসবহ-

আড় নয়ানে শিব চাহে এক দিষ্টে।
লাফ দিয়া উঠে শিব বলদের পিষ্ঠে।।
চল চল বলি শিব ঠেলা দিল পায়ে।
অন্তরীক্ষে যায়ে বৃষ বায়ুগতি ধায়ে।।

টিপ্পনী

বয়স্ক শিবের চুরি করে পরনারীর কাছে যাওয়া, দেবী চন্ডী কর্তৃক ছলনা হাস্যরসের উদ্রেক করে। বিবাহ বাসরে শিবের উক্তি-

'হাসি বোলে শূলপাণি আইয় ভাড়াইতে জানি
লেংগটা হইয়া মধ্যে দাঁড়াইব।।
দেখিয়া আমার ঠান আইয়র উড়িব প্রাণ
লজ্জা পাইয়া যাবে পলাইয়া।।'

'বাহির সহিত যুদ্ধ' পর্বে ও কবির বর্ণনা হাস্যরসাত্মক-

যেমন-

'ভিঙ্গুরের কামড়ে জর্জর সর্বজন।
অধিক তাপ হইল চোতরার কারণ।।
কেহ বলে মৈলুম মৈলুম কেহ বলে আহা।
হিন্দুর ভূত এই প্রত্যক্ষেতে সহা।।'

কাব্যমধ্যে হাস্যরস থাকলেও করুণরস আদ্যন্ত লক্ষিত হয়। 'মনসাকে চন্ডীর দর্শন ও প্রহার' অংশে মাতৃহীন পদ্মার পরিণতি করুণ রসে সিক্ত। সনকা ছয়টি সন্তান হারিয়েছেন আর আজ প্রিয় লখীন্দরকে হারিয়ে সর্বরিক্ত সর্বশূন্য হয়ে মাতৃহৃদয়ের গভীর হাহাকার কাব্য মধ্যে বিরাজিত।-

'বার্তা পাইয়া সোনকা আসিল লড় দিয়া।
আহা পুত্র বলি পড়ে ভূমে পাছাড় খাইয়া।।
সোনাই বলে পাইয়াছিলাম অখিলের নিধি।
দিয়া বঞ্চিত হইলা দারুণ বিধি।।'

চন্দ্রধর একে একে ছয় পুত্র হারিয়ে আজ পাথর হৃদয়, তাই লক্ষীন্দরের মৃত্যুতে তার হৃদয় ফেটে গেলেও মৃতের সৎকারের কথা ঘোষণা করেছেন। চন্দ্রধরের কান্নার প্রসঙ্গ সোমাই পন্ডিতের কথায় ধরা পড়েছে-

'সোমাই বলে চান্দো তুমি আর কান্দ কিসে,'

বিজয়গুপ্ত তার কাব্যে বেহুলার বিবাহের পর সমর্পণে সুমিত্রার ক্রন্দন উজানির আকাশ

বাতাস ভারি করে তুলেছে। কণ্যা বেহুলা তার প্রাণ তার উক্তিতে-

'কৈ যায়ে অভাগিনীর প্রাণ লইয়া বেউলায়।।'

বেহুলাই একন লক্ষীন্দরের স্ত্রী, তারা জন্মান্তের সঙ্গী -তাই বাসর রাত্রিতে সর্পাঘাতে প্রাণ বিয়োগ ঘটলে বেহুলার আর্তনাদ-

'প্রাণ ফাটিয়া যায়ে বিদরয়ে বুক।
দুঃখ পাসরিব আমি দেখিয়া কার মুখ।।'

কাব্যের অন্তিম পর্যন্ত তাকে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে এবং শেষে সাধনার ফল মিলেছে। তবে দুঃখময় যাত্রার মধ্য দিয়ে বেহুলাকে সার্থকতার কিনারে পৌঁছতে হয়েছে।

পদ্মাপুরাণে বেহুলা-সনকা-সুমিত্রার ক্রন্দন নয় সমগ্র চম্পক নগরীর মানুষের মধ্যে এক শোকার্ত পরিবেশ সক্ষ করা যায়। স্বামী ও অন্যান্যদের বাঁচানোর পর নিজ বাড়ীতে অতিথির মত উপস্থিত হয়ে শ্বশুরালয়ে যাত্রার কথা বললে সুমিত্রা বেহুলার জন্য কেঁদে আকুল-তেমনি বেহুলাও-

'সুমিত্রা বলে বেউলা কি কথা কহিলি।
নিভিল মনের অগ্নি জ্বালিয়া যে দিলি।।
কান্দিয়া বিকল বেউলা চিত্ত নহে স্থির।'

সমগ্রকাব্য জুড়ে করুণ রসের রাগিনী বেজে চলেছে যা কাব্য পাঠে উপলব্ধ।

৪.১.৯ কবি নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের তুলনামূলক আলোচনা :

নারায়ণদেব তার মঙ্গলকাব্য রচনার ক্ষেত্রে মূল প্যাটার্ন অনুসরণ করেছিলেন। মনসামঙ্গল রচনার সময় পৌরাণিক অংশ বর্ণনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত পুরাণকে অবলম্বন করেছেন। তার পদ্মাপুরাণ তিনটি খন্ডে বিভক্ত-

(১) কবির আত্মপরিচয় ও দেব বন্দনা, (২) পৌরাণিক আখ্যান সংযোজিত হয়েছে, (৩) চাঁদ সদাগরের কাহিনী। পদ্মাপুরাণ রচনায় কবির 'স্বভাব-স্ফূর্তি সরস' কবিত্ব বর্তমান। তার কাব্যে পান্ডিত্যের অভাব নেই। তিনি কাব্যকে করুণ রসের কাব্য রূপে গড়েছেন এবং তাঁর কবিত্বশক্তি ছিল উচ্চাঙ্গের।

অপর দিকে কবি বিজয়গুপ্তর কবিত্ব শক্তি যে খুব উচ্চাঙ্গের ছিল তা বলা যায় না। তার কাব্যও করুণ রসের কাব্য। তবে সামাজিক চিত্র তার কাব্যে অধিক পরিমাণে ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত দেব-দেবী চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত মানব চরিত্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নারায়ণ দেবের কাব্যে পৌরাণিক কাহিনীর বিস্তৃত পট আছে কিন্তু বিজয়গুপ্তের কাব্যে তৎকালীন সমাজের চিত্রের সঙ্গে-

'তাঁহার কাব্যমধ্যে এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ রহিয়াছে; তাহা হইতেই তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় ও সুলভ হইয়াছে।' (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য)

টিপ্পনী

নারায়ণদেবের কাব্যে অশ্লীলতা উঁকি মেরেছে কিন্তু বিজয় গুপ্তের কাব্যে দু-একটি স্থান ছাড়া তার উত্তরণ লক্ষিত হয়। আর যাকে অশ্লীলতা বলছি তা রঙ্গব্যঙ্গ ছাড়া কিছুই না। যেমন-

'হাসি বলে শূলপাণি এয়ো ভান্ডাইতে জানি
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান এয়োর উড়িবে প্রাণ
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে।।'

টিপ্পনী

এ উদ্ধৃতি সম্পর্কে আশুতোষ বাবু মন্তব্য করেছেন-

'এই নিখুঁত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বিজয়গুপ্ত প্রাক্-চৈতন্য সমাজের যে অকৃত্রিম একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র প্রাচীন লোকসাহিত্যের দিক হইতেই নহে, বাংলার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের দিক হইতেও পরম মূল্যবান হইয়া আছে।'

বিজয়গুপ্ত কানা হরি দত্তকে অনুসরণ করেছেন। নারায়ণ দেবের কাছে ছন্দের বৈচিত্র্য তেমন দেখা যায় না কিন্তু বিজয়গুপ্তের কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কাব্য জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে বিজয়গুপ্তের কাব্য বাংলায় ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল কিন্তু নারায়ণ দেবের কাব্য শুধু বাংলায় নয় আসামেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অসমীয়ারা তাকে নিজেদের কবি বলে শ্রদ্ধাভক্তির আসনে বসিয়ে ছিলেন। নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদ সদাগরকে এক পৌরুষ কঠোর শৈব উপাসক হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। বিজয় গুপ্ত চান্দোকে সেভাবে চিত্রিত করতে ব্যর্থ। এ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য-

''তিনিই চাঁদ সদাগরকে দিয়া বাম হস্তে মুখ না ফিরাইয়া একটি ফুল দিয়া 'পূজা' করাইয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য কোন কোন কবি, এমন কি, বিজয় গুপ্তও তাঁহাকে দিয়া ঘটা করিয়া মনসার পূজা করাইয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। এই দিক দিয়া নারায়ণ দেবের রচনায় কাব্যগুণ অধিক প্রকাশ পাইয়াছে বলিতে হইবে।''

কবি নারায়ণ দেবের কাব্যাংশ বিজয় গুপ্ত অপেক্ষা স্বাভাবিক। আর বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের কাহিনীতে সনকা চরিত্রটি বাস্তবতা মন্ডিত। 'মানব চরিত্রের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি বিজয় গুপ্তের কাব্যের আর একটি বিশিষ্ট গুণ।' পরিশেষে সকল মঙ্গল কাব্যের কবিদের কাব্য সম্পর্কে আশুতোষ বাবুর সঙ্গে সহমত হয়ে বলা যায়-

'পূর্ববর্তী কাব্যগুলির ন্যায় বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণও নানা হস্ত স্পর্শে নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে।'

৪.১.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলী :

১. বিজয় গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল ও কবি কৃতিত্ব আলোচনা কর।

২. বিজয় গুপ্তের চরিত্র চিত্রণ দক্ষতার পরিচয় প্রদান কর।

৩. পদ্মাপুরাণ কাব্যে বিজয় গুপ্তের সমাজ মনস্কতার পরিচয় দাও।

৪. বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার প্রয়োগের নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।

৪.১.১১ সহায়ক গ্রন্থ :

১. শ্রী জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

২. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস।

৩. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)।

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নারী ও পুরুষ চরিত্র-শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৭. মধ্যযুগের সাহিত্যে গতানুগতিকতা বনাম মৌলিকতা-অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মনসামঙ্গল : কেতকাদাস ক্ষেমনন্দ

৪.২.১ ভূমিকা

৪.২.২ কবিপরিচয়

৪.২.৩ কাব্য রচনাকাল

৪.২.৪ মনসামঙ্গল ও সর্প - সংস্কৃতি

৪.২.৫ মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির আর্থসামাজিক ও সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

৪.২.৬ মধ্যযুগের সমাজ - সংস্কৃতির প্রতিফলন মনসামঙ্গল কাব্যে

৪.২.৭ মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

৪.২.৮ চরিত্র (শিব, চন্ডী, মনসা, নেতা, চাঁদ সদাগর, সনককা, বেহুলা, লখিন্দর)

৪.২.৯ সহায়ক গ্রন্থাবলী

টিপ্পনী

৪.২.১ ভূমিকা

১৮৪৪ সাল। মঙ্গলকাব্য ধারার কবিদের মধ্যে প্রথম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল মুদ্রিত হল। কেতকাদাস দক্ষিনবঙ্গের কবি। তিনি দক্ষিবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ - একথা অনেক পন্ডিত - গবেষক অনুমান করেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তাঁর কারণে তাঁর গ্রন্থের পুঁথি পাওয়া যায় বঙ্গদেশে। খন্ড-বিচ্ছিন্ন ভাবে এক একজন লিপিকার এক একটি পালার অনুলিপি তৈরী করেন। এগুলিই জনসমাজে বেশি পরিচিত। 'মনসার ভাসান' নাম দিয়ে বটতলার প্রকাশকরা অর্থের লোভে কাব্যের খাঁটিত্ব রক্ষা না করে প্রভূত পরিমানে প্রকাশ করেছেন। এটা উনিশ শতকের মাঝামাঝি বেশি লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থকার রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যে বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থেও একমাত্র ক্ষেমানন্দের কথাই উল্লেখ করেছেন মনসামঙ্গল কাব্য ধারা কবি হিসেবে।

কিন্তু সঠিক অর্থে বিশ শতকই শুরু হল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের সামগ্রিক গ্রন্থ নিয়ে চর্চা। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল এর প্রথম খন্ড। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক বিশিষ্ট অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৯৬১ সালে 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল নাম দিয়ে সাহিত্য অকাদেমী থেকে প্রকাশ করলেন কাব্যটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এতে দেবখন্ড ছিল না। শুধুমাত্র চাঁদ বণিকের কাহিনীটি ছিল। ছয় সাত বছর আগে অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশ, অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম, অধ্যাপক তন্ময় মিত্রের যৌথ সম্পাদনায় 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

: মনসামঙ্গল' নাম দিয়ে আর একটি মনসামঙ্গল কাব প্রকাশিত হল । এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হল সম্পাদনার জগতে যাকে বলে ফ্যাক সিমিলি সংস্করণ এঁরা সেই আদর্শকে অবলম্বন করেছেন। অতি সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটিতে কাব্যটির অনেকদিকই আলোচিত হয়েছে। তবে এ বিষবে পূর্নাঙ্গ সম্পাদনার কৃতিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য 'প্রত্নপুঁথিপন্ডিত' অক্ষয়কুমার কয়াল ও তাঁর সহযোগি শ্রীমতী চিত্রা দেবের।

টিপ্পনী

৪.২.২ কবিপরিচয়

মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণের পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার বিশিষ্ট কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যান কবিদের মতো কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের জীবন বৃত্তান্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন । কাব্যে কবি নিজের সম্পর্কে সামান্যই বলেছেন। সেখান থেকে নানা দিক অনুসন্ধান করে তাঁর ব্যাক্তি পরিচয় সম্পর্কে কিছু কথা জানা যায় । কবির জন্মভূমি বর্ধমানের কাঁথড়া । পিতা শঙ্কর । তিনি বলিভদ্র বা বলভদ্রের তালুকে বসবাস করতেন । তিনি সম্ভবত 'মন্ডল' উপাধিক রাজকর্মচারী ছিলেন। এদিকে বলিভদ্রের মৃত্যু হলে সেখানে কিছু উৎপাৎ দেখা যায়। সেখান থেকে শঙ্কর চলে আসেন জমিদার ভারামল্লের আশ্রয়ে। ভারামল্লের কাছ থেকে পাঁচটি গ্রাম তিনি দান হিসেবে পান। সেখানে কবির পিতা সপরিবারে বসবাস করতে লাগলেন।

একদিন কবির মা রেগে গিয়ে ছেলেকে মাঠ থেকে খড় কেটে আনতে বললেন । কবি তখন ভাই অভিরামকে নিয়ে মাঠে গেল। বেলা পড়ে এল মাঠে। গিয়ে দেখে সেখানে কজন বালক মাছ ধরছে। ক্ষেমানন্দ তাদের সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরতে চাইলে তাঁরা রাজী হল না । তখন কবি রেগে গিয়ে তাদের সব মাছ কেড়ে নিয়ে ভাই অভিরামকে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। বাকী ছেলের দল ক্ষেমনন্দকে গালাগাল করতে করতে বাড়ি চলে গেল। ফাঁকা মাঠে খড় কাটবার জন্য ক্ষেমানন্দ একা পড়ে রইলেন। এদিকে মাঠে 'খড় না মিলায় বিধি'। হঠাৎ ঝড় এল। প্রায়ান্ধকারের মধ্যে কবি সম্মুখে দেখলেন এক মুচি মেয়েকে। মেয়েটি কাপড় কেনার টাকার কথা বলে কবির সাথে ছলনা করতে লাগলেন।

"বসন দে খ্যায়া মোরে :। কপট চাতুরী করে: যত্নে লুকাইয়া দেয় টাকা ।।"

এমন সময় কবির খেয়াল হল তাঁর পায়ে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। পায়ে হাত দিয়ে উঠেই দেখে মুচিনী নেই । এবার কবি কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়ল । তাঁরপর দেখলেন অনেক সাপ তকে বেষ্টন করে এগিয়ে আসছে। পরমুহূর্তেই দেখলেন ভুজঙ্গ বেষ্টিত হয়ে দেবীমনসা আবির্ভূত হলেন । তিনি কবিকে দেখা দিয়ে বললেন যে মুর্তি কবি দেখলেন তা যেন কাউকে প্রকাশ না করেন । প্রকাশ করলে কবির অমঙ্গল হবে । তাঁরপরই কবিকে নির্দেশ দিলেন -

"শুন পুত্র ক্ষেমানন্দ : কবিত্ব করিয়া বন্ধ : আমার মঙ্গল গায়্যা বুল ।।"

এই আদেশ পেয়ে কবি মনসা মাহাত্ম্য কথা লিখতে শুরু করলেন।

যেহেতু আমরা কবির পরিচয় জানছি কাজেই প্রাসঙ্গিক ভাবে দুটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমটি হল কবির নাম নিয়ে নানা মত পান্ডিত মহলে। আর দ্বিতীয়টি হল কবি কায়স্থ কিনা। আসলে কি এ বিষয়ে যদি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতেন এদুটি প্রসঙ্গ তাহলে আর সমস্যাই থাকতো না। কিন্তু মধ্যযুগের অপরাপর কবিদের মতোই নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে কবি কৃপন। তাই এই বিতর্ক তৈরী হয়েছে কবিকে কেন্দ্র করে।

টিপ্পনী

আমরা প্রথম প্রসঙ্গে আসি। কবির নাম আসলে কোনটি ? কেতকাদাস না ক্ষেমানন্দ ? কোনটি কবির পিতৃদত্ত নাম ? এ বিষয়ে রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দকে আলাদা দুজন কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ও তেমনটাই মনে করেন। অবশ্য তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' গ্রন্থে শেষ পর্যন্ত বলেছেন -

"মনসা ভক্ত ক্ষেমানন্দ আপনাকে সম্ভবত : কেতকাদাস বলিয়া পরিচয় দিয়েছিলেন।"

আর একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক যতিন্দ্রমোহন দত্ত ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার একটি সংখ্যায় কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দকে আলাদা আলাদা ব্যাক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। এবং ক্ষেমানন্দের তুলনায় কেতকাদাস যে অর্বাচীন সময়ের কবি তাও তাঁর মনে হয়েছে।

'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' কার অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন -

"ক্ষেমানন্দ নিজেকে কেতকাদাস অর্থাৎ মনসার দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁর কাব্যের কোনও কোনও স্থলে কেল কেতকাদাস ভনিতা দেখিয়ে তাঁহাকে স্বতন্ত্র লোক বলিয়া ভ্রম করিবার কোনও কারণ নাই।"

অধ্যাপক সুকুমার সেন মনে করেছেন 'কেতকাদাস' নামটিই আসল। কেনা ক্ষেমানন্দ ভনিতায় আরো দু'তিনজন মনসামঙ্গল লিখেছিলেন।

তবে আমাদের ধারণা, কবি আত্মবিবরণীতে যেভাবে ক্ষেমানন্দ নামটি ব্যবহার করেছেন, তাতে বোঝা যায় এটিই কবির আসল নাম। আর 'কেতকাদাস' কবির নিজের ব্যবহৃত উপাধি। 'কেতকাদাস' কে ব্যাসবাক্যে ভাঙলে দাঁড়ায় 'কেতকার দাস'। 'কেতকা' শব্দটি 'কেতকী' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ কেয়া'। কবি তাঁর কাব্যে মনসার জন্ম কেয়াবনে দেখিয়েছেন, পদ্মবনে নয়। তাই দেবীর নাম কেতকা। অর্থাৎ বিষয়টি দাঁড়ায় এমন কেতকা <কেতকী<কেয়া। আর যেহেতু ইনি স্বয়ং দেবীর দর্শন পেয়েছিলেন কাজেই নিজেকে তিনি কেতকার 'দাস' ভাবতেই পারেন। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। সুতরাং ভাবা যেতে পারে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের আসল নাম ছিল ক্ষেমানন্দ এবং কেতকাদাস ছিল তাঁর নিজের দেওয়া উপাধি।

টিপ্পনী

এবার আসা যাক কবির বংশ পরিচয়ে এখানেও নামের মতোই সমস্যা দেখা গেছে। পণ্ডিতগন নিজেরা নির্দিস্ট কোন একটি সিদ্ধান্তে স্থির হতে পারেন নি। অধ্যাপক সুকুমার সেন মনে করেছেন, কবি ছিলেন কায়স্থ বংশীয়। এর কারণ হিসেবে অধ্যাপক সেন বলেছেন, যেহেতু কবি ভণিতায় বলেছেন -

"ক্ষেমানন্দ বাণী : রক্ষ ঠাকুরানি " কায়েস্থ যতেক আছে।।"

তাই তিনি নিশ্চয়ই কায়স্থ ছিলেন। আবার আর একটি সমস্যা হল কবি যেহেতু পিতৃপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন তাঁর পিতাঁর নাম শঙ্কর মন্ডল। কাজেই 'মন্ডল' কিভাবে কায়স্থ বর্গীয় হবে, এই নিয়ে পন্ডিত মন্ডল আলোড়িত। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাথ্যায় মন্তব্য করেছেন -

"মন্ডল পদবীধারী লোক কায়স্থদের মধ্যে বেশি নেই, আগে ছিল বলে জানা যায় না। অতএব, যে সমস্ত জাতির লোকদের মধ্যে 'মন্ডল' পদবী দেখা যায়, ক্ষেমানন্দ তাদেরই কোনটির অন্তর্ভুক্ত ছিললেন বলে মনে হয়।"

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় নিজেই এই বিতর্কের সমাধান দিয়ে বলেছেন -

"ভারামল্ল কিংবা ক্ষেমানন্দের আর কোন পৃষ্ঠপোষক হয়ত কায়স্থ ছিলেন, বোধহয় সেইজন্যেই কবি মনসাকে কায়স্থদের রক্ষা করতে নির্বন্ধ জানিয়েছেন।।"

তবে একটা বিষয় মনে করা প্রয়োজন তা হ'ল কবির পিতা তাঁর আগের বাসস্থান কাঁথড়া ও পরের বাসস্থন জগন্নাথপুরে যথেষ্ট খ্যাতিও প্রতিপত্তির সঙ্গেই বাস করতেন। আগে জমিদারীসেরেস্তায় হিসেব দেখকাশোনার কাজ করতেন কায়স্থ বংশীয়রাই। আর তাছাড়া সমাজের মোড়ল স্থানীয় লোকেরাই 'মন্ডল' উপাধি পেতেন। বোধ হয় এক্ষেত্রেও তাই - ই হয়েছে। অতএব এটা মনে করাই অধিক সঙ্গত যে কবিরা জাতিতে ছিলেন কায়স্থই। কবির পিতা তাঁর কাজের সূত্রেই মন্ডল উপাধি পান। কেননা আগে উপাধি কর্মবিচারেই হত।

৪.২.৩. কাব্যরচনাকাল

বিদগ্ধ পন্ডিত ও প্রখ্যাত পুঁথি - সংগ্রাহক অক্ষয়কুমার কয়াল দুটি পুঁথি সংগ্রহ করেন, যেখানে কবি কাব্য রচনাকাল সম্বন্ধে একটি শ্লোক লোখেছেন। সেটি অবশ্য শকাঙ্ক নির্দেশ করে। হেঁয়ালিপুর্ন ত্রিপাদীটিতে কাল নির্দেশিত হয়েছে। এভাবে -

"শূন্য রস বাণ শশি শিয়রে মনসা আসি

আদশিলা রচিতে মঙ্গল।"

একে বিশ্লেষন করলে পাওয়া যায় (শূন্য = ০ রস = ৬, বা =৫ শশী = ১) ১৫৬০ শকাব্দ (অঙ্কস্য গতির নিয়মে) অর্থাৎ ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ।

এই শ্লোকের পাশাপাশি কবি তাঁর আত্মবিবনরণীতে এমন কয়েকজন ব্যাক্তির নাম উল্লেখ করেছেন যাঁদের ইতিহাসগত পরিচয় পাওয়া যায়। একজন বারা খাঁ, বাকী

দুজন কেশবমল্লের পুত্র রাজা ভারামল্ল ও বিষ্ণুদাস। বারা খাঁর পরিচয় হল তিনি ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা। আর বিষ্ণুদাস ও ভারামল্লের পিতা কেশবমল্ল ছিলেন মোঘলযুগের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তি । বারা খাঁর সম্পর্কে আরো জানা যায় যে তিনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর পুত্র শিবরাম চক্রবর্তীকে কুড়ি বিঘা ব্রক্ষোত্তর সম্পত্তি দান করেন। দীনেশচন্দ্র সেন জানান যে ঐ দানপত্রটি ১০৪৭ সালের ১লা ফাল্গুন অর্থাৎ ইংরেজি ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারী মাঝামাঝি সময়ে লেখা। এই হিসেব ধরলে বারা খাঁর মৃত্যু ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের আগে কোন মতেই হতে পারে না। অথচ কবির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বারা খাঁর মৃত্যু হলে সেখানে গোলমাল দেখা দিলে কবিরা সপরিবারে সে স্থান ত্যাগ করেন। আসেন জগন্নাথপুরে। সেখানে থাকাকালীন আরো কিছুকাল পর দেবীর দর্শন পান। সেটি ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ। এখানে একটা সমস্যা তৈরী হল। এর সমাধান অবশ্য করলেন 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়। তিনি নির্দিষ্ট ভাবে জানান যে ঐ দলিল বারা খাঁর যে স্বাক্ষর আছে তা নিয়ে কোন সমস্যা নেই সমস্যা তাঁরিখটি নিয়ে। তিনি বলেন ১০৪৭ বঙ্গাব্দ নয় সালটি ১০৪১ বঙ্গাব্দ। কোন কারণে ১ সংখ্যাটি ৭ এর মত দেখতে লেগেছে। সে কারণও তিনি বলেন। এই হিসেব সম্বন্ধে সবাই একমত হন। সেক্ষেত্রে সালটি দাঁড়ায় ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ। এটি বাস্তাবানুগ বলেই মনে হয়।

এবার যদি বিষয়টিকে পরপর সাজানো যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সেলিমাবাদ পরগণার ফৌজদার বারাখাঁ কমপক্ষে ১০৪১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে সেখানে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কবির পিতা শঙ্কর সপরিবারে সে জায়গা ছেড়ে চলে যান ভারমল্লের আশ্রয়ে ; জগন্নাথপুরে। তিনি কায়স্থ শঙ্করকে পাঁচটি গ্রাম দান করেন এবং রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। তাঁরপর কবি ১৬৩৮ - ৩৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে খড় কাটতে গিয়ে দেবী মনসার দর্শন পান। অনুমান করা যায় তাঁর পরপরই কবি কাব্য রচনায় হাত দেন। এই ঘটনা পরম্পরা অনুযায়ী কাল বিচার করলে মনে হয় কবির দেওয়া তথ্য অমূলক নয়। তবে আমরা বলতে পারি সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধেই কবি তাঁর কাব্য রচনা করেন।

৪.২.৪ মনসামঙ্গল ও সর্পসংস্কৃতি

মনসামঙ্গল এবং সাপ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কেননা সাপের দেবীই হলেন মনসা। আসলে তুর্কী আক্রমণোত্তর বাংলার দিশেহারা মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে কিম্বা বনে-জঙ্গলে বসবাস করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ নদী ও বণজঙ্গলকে কেন্দ্র করেই তাদের গ্রাসাচ্ছাদন হচ্ছিল। এখানেই তাদের নানান হিংস্র জীবজন্তুর কবলে পড়তে হচ্ছিল। সাপ ছিল তাঁর মধ্যে অন্যতম। কাজেই এই বিষধর জন্তুটির থেকে বাঁচতেই সম্ভবত তাঁরা দেবী মনসার কল্পনা করেন।

সর্প পূজা যে শুধু বঙ্গদেশেই হত তা নয়, সুপ্রাচীন কাল থেকেই তা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল । তবে পন্ডিত-গবেষকদের মতে সর্প সংস্কৃতি বা Snake-cult বা Serpent-lore এর সূচনা হয়েছিল প্রায় আনুমানিক ছয় হাজার বছর আগে মিশরে।

টিপ্পনী

পরবর্তী কালে তা প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়োয়ে পড়ে বলে প্রত্ন গবেষকদের অনুমান। আবার অন্য এক দল গবেষকদের মতে, ইউফ্রেটিস নদীর তীরে বসবাসকারী তুরাণী জাতির মধ্যে প্রথম সাপকে দেবতা হিসেবে পুজো করার রীতি চালু হয়েছিল। এরা আবার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লে সে সমস্ত জায়গায় সর্পপুজা চালু হয়। এরাই (তুরাণী জাতি) নাকি ভারতবর্ষে সর্পপূজার আদি প্রবর্তক।

টিপ্পনী

ঋগ্বেদে কয়েকজন সর্প ষির নামোল্লেখ আছে। স্বজ, পুড়াকৃ, তক প্রভৃতি নামে কয়েকজন সর্পদেবতাঁর কথা আছে অথর্ববেদে। ব্যাসদেবের মহাভারতে নাগজাতির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। বাসুকি এদের প্রধান। ইনি সর্পরাজ মনসা এর ভগিনী। বৌদ্ধ সাহিত্যে অহিরাজ কুলের কথা আএ। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে বহুপ্রাচীন এই সর্প-সংস্কৃতি।

এছাড়া ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও যেমন মহারষ্ট্রে জ্যান্ত সাপের পুজো করা হয়। কেরালেতেও হয়। বাংলায় বাস্তুসাপের পুজোর রীতি আছে। তবে জীবজন্তুর পুজোমূলত অনার্য সংস্কৃতির অঙ্গ। তাই অনেকে সর্প-সংস্কৃতিকে অনার্য সংস্কৃতি বলেন।

মনসার আবির্ভাবের কথা বলতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে, বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলী থেকে মনসার আবির্ভাব। এই জাঙ্গগুলি শুক্লবর্ণা, একমুখো, শুক্ল সর্পবিভুষিতা ও চতুর্ভুজা। 'জাঙ্গুলি' শব্দটির অর্থ হল বিষবিদ্যা। পন্ডিতদের মতে ইনি আবার জঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন, কর্ণাটকে নাগপঞ্চমীর দিন স্ত্রী-সর্পের পূজা রীতি প্রচলতি। এদের ভাষায় ইনি নাগমাতা মনোমাঞ্চী বা মাঞ্চাম্মা। ওখনকার সেন রাজারা বাংলায় এলে মঞ্চাম্মা ও সঙ্গে আসেন। এই মঞ্চাম্মা থেকেই মনাসা নামটি এসেছে। সুকুমার সেন এ বিষয়ে মনে করেছেন। ভারতীয় বৈদিক ও ব্রাহ্মনয় ভাবধারার মধ্যে দিয়ে মনসার আগমন ঘটেছে। ঋগ্বেদে ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে 'মনসা শব্দটি সন্ধান পাওয়া যায়।সংস্কৃত 'মনস' থেকে 'মনসা' শব্দটি এসেছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবী ভাগবতে মনসার ধ্যানমন্ত্র লেখা আছে। রামাই পন্ডিতের ধর্মপূজা বিধানেও বিষহরির দুটি ধ্যানমন্ত্র আছে। এই সব ধ্যানমন্ত্রে মনসার যে চিত্র ফুটে ওঠে তাতে কোথাও এটা প্রমাণিত হয় না যে মনসা অনার্য সম্ভূতা বা বৌদ্ধসংস্কৃতি জাত। এই মনসা গৌরবর্ণা, পদ্মাসনা, সপর্পনির্মিত মুকুটশোভিতা, মহাজ্ঞানযুতা, নাগযজ্ঞোপীত ধারিনী ও সিদ্ধিদাত্রী। এছাড়া বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাথরের যে মনসা মূর্তি পাওয়া গেছে তাতেও দেখা গেছে তিনি আর্য সংস্কৃতি ধারার বাহিকা। সুকুমার সেনের আলোচনা থেকে বোঝা যায় বৈদিক ইলা সরস্বতী ও শ্রী, বৈদিক বাক্, বৈদিক রুদ্রের মনা, বৈদিক সর্পরাজ্ঞী বা বসুন্ধরা, বৈদিক নৈর্ধতি ও অরায়ী অর্থাৎ অপঘাতিনী ও অলক্ষ্মী, পরবৈদিক কমলাসনা দেবী, নাগলাঞ্জন দেবী, বিষনাশিনী মায়ুরী এদের মিশ্রণে মনসার উৎপত্তি।

এপ্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যেতে পারে বাংলা মনসার পূজা রীতি কতদিনের প্রাচীন। বাংলার বাইরের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মনসার যে মূর্তি পাওয়া গেছে নানা

সময়ে, মূর্তি গবেষকরা তা বিচার করে দেখেছেন যে তাঁর নির্মাণকাল আনুমাণিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। কেউ কেউ অবশ্য কোন কন মূর্তি পালযুগে নির্মিত বলে ধারণা করেন। সেক্ষেত্রে অষ্টম-নবম শতাব্দীতে এগুলি নির্মিত। বাংলার বাইরেও মনসা পূজা প্রচলিত ছিল। তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় বিহারের রাজগীরে মাটি খুঁড়ে একটি সর্পমন্দির পাওয়া গেছে তাঁর ভেতরে নারীরূপা নাগিনীমূর্তি অবিকৃত ভাবেই পাওয়া গেছে। পাঞ্জাব, উত্তরাঞ্চল, উড়িষ্যার সর্পমন্দির আছে। আর বংলায় মনসামঙ্গল কাব্য রচনার সূত্রপাত হয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

টিপ্পনী

৪.২.৫.মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির আর্থ-সামাজিক ওসাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

মঙ্গল কাব্য হল সেই কাব্য যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে মধ্যযুগীয় বাঙালির সামগ্রিক জীবনচিত্র। বাঙালির সামজিক রীতিনীতি সংস্কার - লোকবিশ্বাস তাঁর খাঁটিত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে মঙ্গলকাব্যে এ কাব্য মূলত আখ্যান কাব্য যেখানে কোন লৌকিক কিম্বা পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। দেবদেবীরা ভয় দেখিয়া কিম্বা করুনা করে মর্ত্য মানব-মানবীকে দিয়ে তাঁদের পূজা প্রচার করিয়েছেন। দেবদেবীর পূজা মর্ত্যে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে সবকটি মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় - মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ন শাখা হল মঙ্গলকাব্য। যেখানে কোন দেব দেবী মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। শুধু তাই নয় এ কাব্য পাঠে কিংবা শ্রবনে পাঠক বা শ্রতাঁর পার্থিব ও পারমার্থিক মঙ্গল হয়।

মঙ্গলকাব্যগুলি সৃষ্টির পেছনে দায়ী ছিল হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথা। হিন্দুসমাজে ঐক্য ছিলনা কখনো। বরং বৈষম্য এত প্রকট ছিল যে, বহিশত্রুরা আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করার নিজস্ব শক্তি ছিলনা এই হিন্দুদের। এক সময় স্মার্তরা অনুভব করল নিম্নবর্গীয়দের সাহায্য ছাড়া তাঁদের টিকে থাকা দায়। তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনে নিম্নবর্গীয়দের কাছে টানলেন। তবে তেলে জলে কিন্তু মিশ খেল না। যা মিলন মিশ্রন সব ওপর ওপর। তবে এই আপাত মিলন - মিশ্রণ কবিদের কাব্য রচনার রসদ দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণদের এই সহাবস্থান মঙ্গলকাব্যগুলি রচনার ভিত্তি বলা যেতে পারে। পৌরাণিক তথা উচ্চকোটির দেবতা ও লৌকিক তথা নিম্নবর্গীয় দেবতা এই প্রথম পাশাপাশি বসলেন।

মনসা -চন্ডী-ধর্ম - এই তিন প্রধান মঙ্গল দেবদেবীর উত্থান হয়েছে সমাজের একেবারে নিম্নশ্রেণী থেকে। আসলে তুর্কী আক্রমণ পরবর্তী পরিস্থিতিকে সামাল দিতে গিয়ে সমাজের উচ্চবর্গীয় মানুষ মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তৎকালীন সমাজ-ইতিহাস থেকেই এ কাব্যগুলির জন্ম। দেবদেবীর স্বভাব - কল্পনাতেও লেগেছে বিশেষ অর্থ - সমাজিক ও সাংস্কৃতিক হাওয়া।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে কিম্বা ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় তুর্কী আক্রমন ঘটে। ব্রাহ্মন্য সংস্থিতির ধারক - বাহক লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনচ্যুত হন। ইখতিয়ার - উদ্দিন-মূহম্মদ -

বীন - বখতিয়ার খিলজি বাংলার সিংহাসন দখল করেন। আগেই বলেছি, শুধুমাত্র হিন্দুদের বর্ণভেদ প্রথার ফলে সামাজিক অনৈক্যের কারণে লক্ষ্মণ সেনের এমন বিপর্যয়। খিলজি সিংহাসনে বসার পর থেকে ১৩৮ বছরের মধ্যে ৩২ বার রাজা পরিবর্তিত হয়েছে বাংলায়। আসলে সিংহাসন দখল নিয়ে তখন গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র, রক্তপাত চলছিল। তাই কোন মসলমান শাসকের পক্ষে বাংলার সিংহাসন দখল নিয়ে তখন গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র, রক্তপাত চলছিল। তাই কোন মসলমান শাসকের পক্ষে বাংলার সিংহাসনে ছয়-সাত বছরের বেশি থাকা সম্ভব হয়নি। যদি সিংহাসন নিয়ে এমন হত্যাকান্ড চলতে থাকে তাহলে বাংলার সাধারণ জীবনের অবস্থা কত করুণ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই ভয়াবহ, বিধ্বংসী অবস্থা থেকে মানুষ মুক্তি পেতে ভাগ্যবিশ্বাসী ও দৈববিশ্বাসী হয়ে পড়ল। ১৩৪২ সালে বাংলার মসনদে সুলতান সামস্‌উদ্দিন ইলিয়াস শাহ বসলে এই রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হতে থাকে। সাহিত্য - সংস্কৃতি মনস্ক ও প্রজাদরদী এই সুলতানের আমল থেকে বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলির উদ্ভব।

টিপ্পনী

মঙ্গলকাব্য ধারায় রচিত প্রথম মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গল কাব্য। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর আগে এই মনসাপূজা বাংলায় প্রচলিত ছিল বলে পন্ডিতদের অভিমত। তবে মনসা উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায়ের পূজো পেয়ে আসেননি। আগে নারীকূলের পূজো পেয়েছে, পরে অভিজাত পুরুষের পুজো পেয়েছেন। মনসার পুজো পাওয়ার এই ইতিহাসটি ধরা আছে মনসামঙ্গলে। নিম্নবর্গে পূজিত হয়ে তাঁরপর তিনি পূজিত হন উচ্চবর্গে। সে সময় বণিকরাই ছিল উচ্চবর্গীয়। কারণ বাণিজ্য করে তাদের প্রভূত অর্থ এল হাতে। তৎকালীন রাজাদের চাইতেও বণিকদের প্রভাব ছিল বেশি। মুসলমানরাও এই বণিকদের উৎসাহ দিতেন। কাজেই মনসা শৈব চন্দ্রধর সদাগরকে লক্ষ্য করলেন। তাঁর হাতে পুজো পেলেই সমগ্রসমাজে মনসার পুজো প্রিষ্ঠিত হবে। কিন্তু চন্দ্রধর মনসার পূজায় অনাগ্রহী। তখন মনসা চাঁদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র ও কৌশল অবলম্বন করলেন - পূজা পাওয়ার জন্য। তাঁ দৈবীগুনের চাইতে হিংস্র রূপই বেশি প্রকাশিত হল। দেবীর এমন রূঢ় - ক্রুর চরিত্র চিত্রণ অবশ্যই তৎকালীন যুগ-পরিবেশেরই প্রতিনিধিত্ব করে। মনসার একমাত্র উদ্দেশ্য যে কোন মূল্যেই হোক উচ্চসমাজে পূজিত হওয়া। এখানে কোন আদর্শ, বিবেক কাজ করেনি। মধ্যযুগের সমাজের যাঁরা চালিকাশক্তি ছিলেন তাদের শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ছিল বিবেকহীণতাআদর্শহীনতা।

চন্ডীমঙ্গল ও রচিত হয়ে সমাজ-সংস্কৃতির কথাকে কেন্দ্র করে। এ কাব্যের দুটি কাহিনী। একটিতে একেবারে অন্ত্যজ সমাজের কথা আছে। অন্যটিতে বণিক সমাজের কাহিনী বর্ণিত। প্রথম গল্পেআছে আদিম মানুষের গোষ্ঠী। দ্বিতীয় গল্পে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা। এই দুই গল্পে এক দেবীর দুই সত্তা। আখেটিক খন্ডে দেবী করুনময়ী। ভক্তবৎসল। বণিকখন্ডে তিনি প্রকৃত অর্থেই চন্ডী। শৈব ধনপতি অহংকারে অন্ধ হয়ে যখন তাঁর ঘটে পদাঘাত করে তখন দেবী চুপ করে থাকেননি। তাঁর যোগ্যশাস্তি দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। একই কাব্যের দুটি গল্পে একই দেবীর স্বভাবের এমন তাঁরতম্য ঘটে যাওয়ার পেছেনে বোধ হয় আর্থ - সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদলই দায়ী। প্রাচীন কাল থেকেই অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষেরা ব্রাহ্মন্য সমাজের ঘৃণা ও অবজ্ঞা পেয়ে এসেছে। তুর্কী

আক্রমণেত্তর বাংলায় এই বঞ্চিত জনজাতিকে সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসার তাগিদ লক্ষ্য করা গেল উচ্চবিত্তদের মধ্যেই। সরাসরি দেব দেবী মারফৎ যদি এই নিম্নজাতির উত্তরণ ঘটে তা হলে গৌঁড়া সমাজপতিদের ও আর বলার কিছু থাকে না আমরা কাব্যে দেখি, ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর তুলনায় উচ্চবর্গীয়। তাকে বাধ্য হয়ে কালকেতুর নেতৃত্ব মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু তাকে রাজা কালকেতুর বিরুদ্ধে তাঁর নীচজাতি তুলে নিন্দা করতেও দেখা গেছে। প্রথমাংশে দেবী চন্ডীর নমনীয় মানসিকতাঁর আরো একটা বড় কারণ হল চৈতন্য ভক্তিবাদ। এর প্রভাব পড়েছিল লেখকদের মধ্যে তাই চন্ডী এত কোমল স্বভাবা। আবার বণিক খন্ডে মনসার আদলে চন্ডীকে দেখা হয়েছে বলে তুলনামূলক ভাবে এখানে তিনি প্রতিহিংসা পরায়না।আসলে সব লেখার পেছনেই একটা সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রত্যক্ষ প্রভাব কাজ করেছে।

টিপ্পনী

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর দিকে তাকালে দেখা যায় এর দুটি কাহিনী - একটি রাজা হরিশচন্দ্র ও রাণি মদনার গল্প ও অন্যটি লাউসেন রঞ্জাবতীর কাহিনী। প্রথমটিতে পুরাণের অনুসরন আছে। মধ্যযুগের সমাজ-অর্থনীতির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই।কিন্তু লাউসেনের কাহিনী সমকালীন ইতিহাস নির্ভর।

রাঢ় বঙ্গের ডোমদের কথা আছে এই গল্পে। ধর্ম এখানে পুত্রবর দাতা। কর্ণসেনের পত্নী রঞ্জাবতী তাঁর ভাই মহামদের কথায় দুঃখ পেয়ে ধর্মের পুজো করতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত পুত্রবর লাভ করলেন। পুত্র হল লাউসেন। তিনি অপরাজেয় বীর। সূর্যকে পর্যন্ত পশ্চিমে উদিত করান। এ সবই লাউসেন করেন ধর্মঠাকুরের প্রভাবে। এই ধর্মও ভক্তের ভগবান, অবিশ্বাসীর শত্রু। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে দেখা যাচ্ছে যে সমাজ সংস্কৃতি মনসা চন্ডীর কাব্য লিখতে প্রেরণা দিয়েছে , সেই সমাজই আবার ধর্মঙ্গল রচনার উৎস হিসেবে কাজকরেছে। নইলে মানসিকতাঁর নির্দিষ্ট একটি পর্যায়ে তিন দেব দেবীই কিভাবে এক হল!

বাংলার অর্থনীতি ব্যবস্থা তাঁর মুদ্রাব্যবস্থার এর পরিবর্তন রাজা প্রজার সম্পর্ক এই ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে। মঙ্গলকাব্যের কবিদেএর হাতে। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই অংশটিতে ইতিহাসের তথ্য একেবারে অবিকৃত ভাবে উঠে আসে। রাজার পাইক - বরকন্দাজদের অত্যাচার, খাজনা আদায়, জোর করে গ্রামে বাস করতে বাধ্য করা - এসবই উঠে এসেছে এই মঙ্গলকাব্য গুলিতে। মধ্যযুগের আর কোন শাখাতেই বাংলার এমন সমাজ -সংস্কৃতিক ইতিহাস বর্ণনার পরিচয় মেলে না।

৪.২.৬.মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতিরপ্রতিফলন মনসামঙ্গল কাব্যে

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যর প্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত হল মঙ্গলকাব্য গুলি। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অন্তত কুড়িজন কবি এই ধারার রচয়িতা ছিলেন। সবারই বিষয় প্রায় কমবেশি অভিন্ন ছিল। মনসামঙ্গলের আখ্যান

বিচার করলে চারটি স্বতন্ত্র সমাজের ছবি পাওয়া যায়। সেগুলি যথাক্রমে- রাখাল বা গোয়ালা সমাজ,জালুমালু বা জেলে মালোদের সমাজ, মুসলমান সমাজ, (হাসান - হোসেন) ও অভিজাত বণিক সমাজ। একটি বাদে বাকী সব কটি হিন্দু সমাজের কাহিনী। এই কাহিনীগুলির মধ্যে দিয়ে টুকরো টুকরো মধ্যযুগীয় সমাজ-সংস্কৃতির ছবি ধরা পড়েছে। এর সুত্রে মঙ্গলকাব্য বাঙালীর জাতীয় সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

টিপ্পনী

মনসামঙ্গলে যে তিনটি হিন্দু সমাজের কথাবর্ণিত হয়েছে তাঁর প্রথমটি হল রাখাল ও গোয়ালাদের। গো পালন এদের কাজ। গরুর দুধ বিক্রিই এদের জীবিকা। কাব্যে আছে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে ধরে মনসা রাখাল বালকদের কাছে এসে দুধ চাইলে তাঁরা বৃদ্ধাকে দুধ না দিয়ে তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করে। এতে মনসা ক্রুদ্ধা য়ে তাদের সব গোরু কেড়ে নিয়ে প্রতিশোধ নয়েছেন। আসলে এখানে একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা হল সমাজের সর্বেসর্বা ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা করলে তাঁর ফল ভালো হয় না।

জালু-মালুর কাহিনী হল জেলেদের কাহিনী। এরা সমাজে নিম্নবর্গীয়। জালু - মালু দুই ভাই। মাছ ধরাই এদের কাজ। চম্পাই নগরের একপ্রান্তে এদের বাস। চাঁদকে তাঁরা খুব ভয় করে। একদিন চাঁদ তাদের ডেকে পাঠাল। তাঁরা এল এবং 'করজোড়ে দুই দাস নোঙাইল মাথা'। চাঁদ্র ব্রাহ্মন ভোজন করাবেন সেই উদ্দেশ্যে একদিনের মধ্যে 'শত ভার মীন' ধরে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল তাদের। কিন্তু অসম্ভব কাজ। দুই ভাই এ কাজে তাদের অক্ষমতাঁর কথা জানালে চাঁদ নির্দেশ দিলেন একাজ না পারলে তাদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হবে। অগত্য -

"বিষাদ ভরিয়া জালু উঠাইল পান।

কান্দিতে কান্দিতে দহে করিল পয়ান।।"

এখানেও স্পষ্ট হয়ে উঠল উচ্চকোটির দ্বারা নিম্নবর্গীয়দের অত্যাচারের কাহিনী।

তবে হ্যাঁ হাসান - হোসেন পালায় প্রশাসক হিসেবে যবন দুই ভাইয়ের ঔদ্ধত্য কবিরা সম্ভবত সমকালীন বাস্তবতা থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। এ কাহিনী অবশ্যই তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী সময়ে গৃহীত হয়েছে মনসামঙ্গলে। হাসান হাটির শাসনকর্তা হাসান মুসলমান হওয়ার হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন। হাসান মনসার প্রতি কামনার দৃষ্টি দিয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে মনসা হাসানকে যার পরনাই অপদস্থ করেন এবং হাসান-হোসেন এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেই অঞ্চলে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। আসলে হৃতবল, বিধ্বস্ত বাঙালী বাস্তবে শক্তিধর না হলেও মনে মনে কল্পনার কিম্বা কবিতাঁর তাঁর ইচ্ছেপূরণ করেছেন।

এবার আসা যাক বণিক সমাজের কথায়। বণিক সমাজের প্রধানতম প্রতিনিধি হিসেবে উঠে এসেছেন চন্দ্রধর বণিক। তিনি শিবের উপাসক ; বণিক শ্রেষ্ঠ। মনসা সমাজের তিন স্তরে নিজের পূজা প্রতিষ্ঠা করে এলেন চাঁদের কাছে। কিন্তু চাঁদ তাকে

অবজ্ঞা করলেন। ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। সংঘাতের সেই শুরু। দুই অমনীয় ব্যক্তিত্বের সংঘাত দেখল কাব্য বাংলাও। এসমস্ত ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে উঠে এসেছে বাংলার সমাজের কথা। হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক সামাজিক অনুষ্ঠানের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। সনকার সন্তান জন্মের সূত্রে সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন ও দশবিধ সংস্কারের নিপুন নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। উচ্চবিত্তদের নারী লোলুপতাঁর চিত্র আছে চাঁদের মহাজ্ঞান হরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে। তাছাড়া জাত-পাতের সংকীর্নতাঁর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় ক্ষুধা-তৃষ্ণায়ন কাতর চাঁদ তাঁর নিম্নবর্গীয় বন্ধুর বাড়িতে অন্নজল গ্রহণ করতে না পারার মধ্যে দিয়ে।

টিপ্পনী

এছাড়া বিয়ের অনুষ্ঠানে নিখুঁত বর্ণনা প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের বর্ণিতব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। পাত্রপাত্রী নির্বাচন, ঘটকালি করা, রাশি,গণ ইত্যাদি মেলানো এসবই এ কাব্যে সুন্দরভাবে চিত্রিত। লখিন্দরএর বিয়ের সময় সায়বেনের কন্যা বেহুলাকে নির্বাচন করা হয়। রূপের সঙ্গং দেখা হয় তাঁর গুণও বিশেষত সাংসারিক কর্মপটুত্ব। স্বভাব চরিত্রের খোঁজ নেওয়া হয়। এরপর বিয়ের অনুষ্ঠান। গায়ে হলুদ, জলসওয়া, অশ্বারোহন, গোমাহার ওপর দাঁড়ানো, অরুন্ধতি দর্শন, পাশাখেলা, দুধ ওথলানো এসব স্ত্রীআচারের নিদিষ্ট বর্ণনা রয়েছে কাব্যে।

মনসামঙ্গলে নারীদের যে ছবি উঠে এসেছে তা বেদনাদায়ক। চাঁদের স্ত্রী সনকাকে দিয়ে তা বোঝা যায়। সে প্রতিব্রতা। কিন্তু তাঁর কোন ব্যাক্তি স্বাধীনতা নেই। নেই নিজস্ব কণ্ঠস্বর। এদিকে তাঁর স্বামী চাঁদ নিজে দাম্ভিক অহংকারী এমন কি চরিত্রবানও নন। নটীর বেশে নইলে মনসা কিভাবে তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করে ? কিম্বা চাঁদ যখন সব হারিয়ে পর্যন্ত তখনও অল্প টাকা বাঁচিয়ে রাখে নটীবাড়ি অর্থাৎ পতিতালয়ে যাবার জন্য। এসবই তো সনকার প্রতি অমর্যাদা। কিম্বা বেহুলা নিয়তি লাঞ্ছিতা নারী তাঁর প্রতিও তো কত কামনা দৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। যেমন মানব সমাজে তেমনি দেবসমাজে। আর একটি ভয়ঙ্কর চিত্র নারীর তৎকালীন অবস্থাকে যথাযথ বর্ণনা করে। চাঁদ দক্ষিণ পাটন যাত্রার আগেই সনকা সপ্তমবারে মত অন্তঃসত্ত্বা হয়। কেউ যাতে সেই আসন্ন সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ না করে তাঁর জন্য চাঁদ একটি সন্দেহ ভঞ্জন পত্র লিখে যান। কিন্তু চাঁদ যখন ফিরে আসে তখন নিজেই ভুলে যায় তাঁর সপ্তম সন্তানের কথা। তখন সনকাকে নিজের সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয় নিজের স্বামীর কাছে তাঁরই লেখা পত্র দেখিয়ে। এ এক চরম লাঞ্চনা নারীত্বের।

এবার সামাজিক রীতি - নীতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। এই লোকাচারের মধ্যে আছে বিয়ে, সন্তানের জন্মের আগে গর্ভের পাঁচমাসে পঞ্চামৃত খাওয়ানো, সপ্তম মাসে সাধভক্ষন। সন্তান জন্মের পর আতুঁড়ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা। ঐ ঘরের বাইরে কলাগাছ লাগানো প্রসূতির মঙ্গলের জন্য কবচ, মাদুলী, গাছের শিকড় , তাগা ইত্যাদি বেঁধে দেওয়া হত। এছাড়া শিশুনিয়ে নানা লোকাচার ছিল। তাঁর যেমন ষষ্ঠ দিনে ঘর অন্ধকার করে মাথার পাশে দোয়াত - কলম রাখা হত ভাগ্য দেবতা ভাগ্য লিখবেন বলে। আটদিনে হত আটকলাই অনুষ্ঠান, নয় দিনে নওা। ছয়মাসে অন্নপ্রাশন। এরপর হাতেখড়ি পাঁচবছরে। এগুলির সঙ্গে কিছু লোকবিশ্বাসের কথা বর্ণিত

হয়েছে। যেমন কিছু মঙ্গল - অমঙ্গল সূচক ছিল। ডান চোখ নাচা, প্রভাতে ভয়ের স্বপ্ন দেখা, যাত্রার শুরুতেই পায়ে হোঁচট লাগা, যাত্রাকালে মাথায় বাড়ির চাল ঠেকা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন বাংলার নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতিকে আজও জীবন্ত ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

৪.২.৭. মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

টিপ্পনী

পূর্বঙ্গের ময়মনসিংহের কবি কানা হরিদত্ত ছিলেন মনসামঙ্গলের প্রথম রচয়িতা। তরপর বিজয়গুপ্ত আটশটি পালায় লিখলেন 'পদ্মাপুরাণ'। কানা হরিদত্তের কাব্য শিল্প গুনান্বিত ছিল না, তা বিজয়গুপ্তের সমালোচনায় স্পষ্ট -

"মূর্খে রচিল গীত নাজানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।"

তাঁর কাব্যে ভাবের অসঙ্গতি, অনুপ্রাসহীনতা, ছন্দোবিচ্যুতি এসব ছিল। তুলনামূলকভাবে বিজয়গুপ্তের লেখায় কাব্যগুন অনেক বেশি ছিল। সমকালীন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছবি তাঁর কাব্যে খুবই সুন্দরভাবে চিত্রিত। তিনি ছন্দ অলংকারের নিপুন ব্যবহার করেছেন তাঁর কাব্যে। বিজয়গুপ্তের পর মনসামঙ্গল লিখলেন দক্ষিনবঙ্গের এক কবি বিপ্রদাস পিপিলাই। কবির নিবাস ছিল অখন্ড চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার নাদুড়্যা বা বাদুড়া - বটগ্রামে। ব্রাহ্মন পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। তাঁর কাব্যের নাম 'মনসা বিজয়'। ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। এঁর কাব্যের মধ্যে বেশকিছু অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। মনসামঙ্গলের আর একজন প্রখ্যাত কবি হলেন 'সুকবিবল্লভ' নারায়ন দেব। বাংলার বাইরে পাশ্ববর্তী রাজ্যে একমাত্র তাঁর কাব্যই প্রসার লাভ করেছিল। নারায়নদেবের কাব্যের নাম ছিল 'পদ্মাপুরাণ'। নারায়ন দেবের কাব্যে পান্ডিত্য, সরলতা স্বাভাবিকতাঁর মিশ্রণ ঘটেছে। কালিদাসের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত ছিলেন। করুণরসের কারবারী ছিলেন কবি। কাব্যে যুগরুচির কারণে কোথাও কোথাও কবির কাব্যে আদিরসাত্মক বর্ণনা লক্ষ্য করা যাব। তাঁর কাব্যে মহাকাব্যের সম্ভবনা থাকলেও যুগরুচির কারণে তা ততটা সার্থক হয়ে ওঠে নি বলে মত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

পশ্চিমবঙ্গে লেখা মনসামঙ্গল ধারার প্রথম কবি হলেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। তাঁর কাব্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তাঁর কারণে কাব্যটি প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ কর (১৮৪৪খ্রী)। পন্ডিত গবেষকদের বেশির ভাগের মতে কেতকা দাস ক্ষেমনন্দ পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি। তবে তাঁর কাব্য পূর্ববঙ্গেও খুব জনপ্রিয় ছিল। সেখানে কাব্যটি 'ক্ষেমানন্দী; নামে পরিচিত ছিল। সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতো পন্ডিত সমালোচকেরা কেতাদাসের কাব্যের মধ্যে উচ্চাঙ্গের কবিত্বকে লক্ষ্য করেছেন। আবার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ক্ষেমানন্দ যত জনপ্রিয় কবি ছিলেন তত যোগ্য কবি ছিলেন না।

ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যে বেশ কিছু অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন। সমস্ত কবিরা

লিখেছেন মনসার জন্ম পদ্ম বনে। সেখানে ক্ষেমন্দ লিখেছেন 'কিয়াপাতে জন্ম লৈল মনসা কুমারী'। তাই তাঁর নাম কেতকা। কবির কাব্য মনসামঙ্গল নামে খ্যাত কিন্তু কোথাও কোথাও 'জগতীমঙ্গল' বা জগাতীমঙ্গল' বলেও পরিচিত। যাইহোক কবির কাব্যে আরো পরির্তন চোখে পড়ে। সব মনসামঙ্গলেই চন্ডী ও মনসার বিবাদের কথা আছে। এই বিবাদেই মনসা এক চোখ কানা হয়। দ্বিজ বংশীদাস লিখেছেন চন্ডীর নখের আঘাতে মনসার চোখ কানা হয় ।ক্ষেমনন্দ সেখানে লিখলেন চন্ডী মনসার বাম চোখ নষ্ট করে দেন 'দাহন অঙ্গারে'। সপ্তডিঙা মধুকর হারিয়ে চাঁদ বাড়ি ফিরলে অন্ধকারে সনকা তাকে চিনতে না পেরে চোর বলে ভুল করেছে। ফলে সনকার কাছে তাকে খুব লাঞ্ছিত হতে হয়। এই কৌতুকপূর্ন করুণরসাত্মক কাহিনী এক মাত্র ক্ষেমানন্দের কাব্যেই পাওয়া যায়। আবার বিজয়গুপ্ত যেখানে লেখেন যে চাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ মনসা নিজেই ক্ষুর নিয়ে এসে বণিকের সাধের 'নন্দন' সুয়াবাড়ি ধ্বংস করেন। কিন্তু ক্ষেমান্দের কাব্যে মনসার নির্দেশে বলবান হনুমান এ কাজ করে। এরকম বেশ কিছু অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায় ক্ষেমান্দের কাব্যে।

টিপ্পনী

এবার আসা যাক ক্ষেমানন্দের পান্ডিত্যের কথায়। অনেকের মতে তাঁর কাব্যের গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে মুকুন্দ চক্রবর্তীর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে কেতকাদাসের কবি প্রতিভা মুকুন্দ চক্রবর্তীর মতো ছিল না। তবে ক্ষেমানন্দ কাব্যের কাহিনী বিভিন্ন পুরাণ পাঠ করে সংগ্রহ করেছেন। কাজেই তাঁর কাব্যের মধ্যে তৎসম শব্দের ব্যবহার করেছিলেন। ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি অভিনবত্ব ও পান্ডিত্ব্য দেখিয়েছেন তা বলা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর রূপ বর্ণনার একটা গতানুগতিক রীতি তৈরী হয়েছিল ।কবিও নিজকাব্যে সাদ্যার মনসার রূপ র্ণনাতে এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তবে তাকৃত্রিম হয়ে পড়েছে। কাহিনীটিকে তিনি বাস্তাবানুগ করার নানা চেষ্টা ইনি করেছেন। লখীন্দরের মৃতদেহ নিয়ে বেহুললা যখন গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে চলেছে স্বর্গের উদ্দেশ্যে তখন মান্দাসক একে একে পেরিয়ে যায় জুঝাটি, গোবিন্দপুর, গাঙ্গপুর, মন্ডল গ্রাম, দেপুর, নোয়াদা, কেজার, আমদিপুর, নারকেলডাঙ্গা, পিড়তলা, ত্রিবেনী প্রভৃতি ঘাট। এগুলি কাল্পিক নাম নয়। বর্ধমান ও তাঁর চারপাশের অঞ্চলের নদীঘাটও গ্রাম এগুলি। এজন্য তিনি অবশ্য আঞ্চলিক পাঠককুলের কাছে জনপ্রিয়ও হয়েছেন। কাব্যটির মধ্যে ধর্মমঙ্গলেরও কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবি বন্দানাংশে ধর্ম ঠাকুরের বন্দনা করেছেন। আবার 'চিত্রলেখার চিত্রাঙ্গন' প্রসঙ্গে 'পরম দয়ালগুরু' ধর্মনিরঞ্জনকে সবার আগে চিত্রিত করতে বলেছেন। দীর্ঘদিন রাঢ়ের ধর্মপূজার ঐতিহ্য ছিল বলেহয় তো কবি তাঁর কাব্যে ধর্মের কথা বলেছেন।

এবার কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের চরিত্র চিত্রণের কথায় আসা যাক। তাঁর কাব্যের মনসা ক্রুর, ছলনাময়ী ও প্রতিহিংসা পরায়ণা। এর কারণ হয়তো মনসার ব্যাক্তি জীবনের দুঃখ ও বঞ্চনা যিনি জন্ম থেকে মা বাবার স্নেহ ভালোবাসাতো পেলই না উলটে পিতাঁর কামনা - বিমাতাঁর নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তাঁর মানস গঠন আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক না হওয়াটাই স্বাভাবিক। মনসা দেবী হলেও কবির লেখনীতে তিনি মানবীরূপে উঠে এসেছেন। তাই তিনি মানুষের মতো ইর্ষাপরায়ন, প্রতিহিংসা

পরায়ণা। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসার এই দিকটিকে তুলে ধরেছেন তাঁরকাব্যে। শিবের গরল পানে মৃত্যুমুখে পাতিত হওয়ার সংবাদে মনসা কষ্ট না পেয়ে আনন্দিত হয়েছেন। কারণ তিনি ঐ পিতাঁর মৃত্যুই চেয়েছেন। তাহলে বিমাতা চন্ডীর অহংকার দূর হবে। প্রতিহিংসা পরায়ণা দেবীর এমন রুক্ষ রূপ আর কোন কবি বর্ণনা করেন নি এভাবে -

টিপ্পনী

" কহিতে সে সব কথা বাড়ে শোকানল।
ভাল হৈল মৈল বাপ খাইয়া গরল।।
অঙ্গার দাহনে চন্ডী মোরে কৈল কানি।
অবিরত দিবানিশি এই মনে গনি।
আজি মনে প্রীত হৈল শুন সমাচার।
এতদিনে চন্ডীর টুটিল অহঙ্কার।।"

অনেক সমালোচকের মতে ক্ষেমানন্দ চাঁদসদাগরের চরিত্রটিও পরিপূর্ণ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। কিন্তু আমাদের ধারণা চাঁদ চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক বির্তনের কবি যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। মনসাএকের পর এক চাঁদের সব কিছু কেড়ে নিচ্ছেন। তাঁর সাধের নন্দন গুয়াকড়ি ধ্বংস হল, চয়পুত্র মারা গেল, সবকটি বাণিজ্য তরীর ভরাডুবি হল। বাড়ী এসে দেখলেন সপ্তম পুত্র লখিন্দরকে। মনে আশার সঞ্চার হল। কিন্তু মনসা যখন তাকেও কেড়ে নিল, তখন সে,রিক্ত, নিস্ব হয়ে পড়ল। তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থার যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা ভীষণ বাস্তাবানুগ -

"লখাই বাসরে মৈল চাঁদ বান্যা বার্তা পাইল
পুত্রশোকে শুকাইল হিয়া।
বিভা দিয়া চাঁদ বান্যা পুত্রের মরণ শুন্যা
নাচে হিন্তালের বাড়ি লয়্যা।।
লখাই মৈল ভাল হৈল।
নির্ভর হৈল মনে কানি চ্যাঙ্গমুড়ি সনে
এতদিনে বিবাদ ঘুচিল।।"

এবার চাঁদ অনেক নিশ্চিন্ত। তাঁর আর হারানোর কিছু রইল না। তাই চোখের জল না ফেলে তিনি প্রচন্ড ক্রোধে উন্মাদ নৃত্য করতে লাগলেন।

ক্ষেমানন্দ চিত্রিত আর একটি চরিত্রের কথা না বললেই নয়। তিনি বেহুলার মা অমলা। কাব্যের নিরিখে যার গুরুত্ব খুব একটা নেই, তবু ও এই চরিত্রটি অঙ্কনে কবির কবিত্ব শক্তিরই পরিচয় মেলে। বেহুলা ইতিমধ্যে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে মর্ত্যে এসেছেন। এসে তাঁরা স্বামী - স্ত্রী যুগি যুগিনীর ছদ্মবেশ নিয়ে নিছনি নগরে বেহুলার পিতৃগৃহে ভিক্ষা

করতে গেল। ভিক্ষা দিতে এসে অমলা বেহুলাকে দেখে স্নেহ পরবশ হয়ে বলেন -

"তোমা দেখি সকাতরে কান্দে মোর প্রাণ।
মোর ঝি বেহুলা ছিল তোমান বন্ধান।।
নাজানি কোথারে গেল মড়া লয়্যা কোলে।
যুগিনি জাগাল্য শোক বেহুলা বদলে।"

এ বর্ণনা ছোট্ট কিন্তু চমৎকার বাৎসল্যরস ফুটে উঠেছে এখানে। মার্তহৃদয়ের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে সন্তানের জন্য।

টিপ্পনী

ক্ষেমানন্দ কোন কোন সমালোচকের কাছে নিন্দিত হন তাঁর কাব্যের সংক্ষিপ্ততাঁর জন্য। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমরা ঊষাহরণ ও ধন্বন্তরি পালার কথা বলতে পারি, যেগুলি যথেষ্ট বড়। যাইহোক সবমিলিয়ে কেতকাদাস ক্ষেমনন্দ তাঁর কাব্যটিকে গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিছু ক্ষেত্রে তা পেরেওছেন। কিন্তু সবক্ষেত্রে যে তিনি উন্নত কবিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন এমনও নয়। ভালোয়-মন্দে কেতকাদাসের কাব্য বাঙালী পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এবং কবি পশ্চিমবঙ্গ তথা দক্ষিণবঙ্গের মনসামঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৪.২.৮. চরিত্র

শিব :

শিব চরিত্রটিকে কেতকাদাসের কাব্যের শুরু থেকেই দেখা যায়। মনসা মঙ্গল শিব মূলত গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। পার্বতী পাটনির ছদ্মবেশ ধরে জলে নৌকা বাইছেন। এমন সময় শিব পার হতে এল। শিব পাটনি রূপী পার্বতীর রূপে মোহিত হয়ে কামনা জর্জর হলেন। পার্বতীকে জানালেন সেকথা 'তুয়া আলিঙ্গন বিনে আমি নাঞি জি'। পার্বতী শিবের সাথে নানা ছলনা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত শিবকে ধরা দিলেন না। বরং 'শিবে ছলি অন্তর্ধান হইল ভবানী"। শিব এখানেকামো মত্ত, লজ্জাহীন পরস্ত্রীলোলুপ পুরুষ। এদিকে শিব আরো কামোন্মত্ত হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। এমন সময় প্রেমাকুল চক্রবাক দম্পতিকে দেখে নিজেকে সামলাতে পারলেন না - 'টলিয়া হরের বীর্য্য পড়ে পদ্মপাতে'। পদ্মের মৃণাল বেয়ে সে বীর্য পাতালে প্রবেশ করলে সেখানে দেবী মনসার জন্ম হয়। এখানে শিব কামান্ধ, প্রবৃত্তিপরায়ন পুরুষ হিসেবেই উঠে এসেছে।

এরপর একবার দেখা যায়, দেবীমনসা পাতাল থেকে উঠে পদ্মবনে বাস করতে লাগলেন। শিব নিজের কন্যাকে চিনতে না পেরে নবযৌবনা নারীর রূপে মুগ্ধ কামান্ধ হয়ে মনসার হাত ধরে বসলেন কিন্তু মনসা নিজের জন্মবৃত্তান্ত শিবকে স্মরণ করালে শিব এই পাপ কাজ থেকে নিরস্ত হন এবং অনুতপ্ত হন। একদিকে তাঁর আত্মভোলা স্বভাব, অন্যদিকে তাঁর জৈবিকতাএই দুটো দিক উঠে এসেছে মনসামঙ্গলে। আধুনিক

কোন কোন সমালোচক প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন এই বলে যে, শিব কি পুরুষতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতাঁর প্রতিভূ, নাকি অনার্য সংস্কৃতি থেকে আগত বলেই তাঁকে এইভাবে দেখে দেবার চেষ্টা হয়েছে।

আবার কাব্যের কোথাও শিবকে অবিবেচক, বোকা হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। মনসাকে ফুলের সাজিতে করে লুকিয়ে বাড়ি এনে শিবানীকে বলেছেন তাঁর অনুপস্থিতে সাজিতে যেন হাত না দেন। যাকে লুকানো তাকেই সাবধান করে দেওয়া। এতো বোকামী। স্ত্রী চন্ডী শিবের অনুপস্থিতে কৌতুহলী হয়ে সাজি খুলে মনসাকে দেখতে পেলেন। বাঁধল কোন্দল। মনসা চোখ হারালেন।

টিপ্পনী

তবে হ্যাঁ, কাব্যের কোথাও কোথাও শিব প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয়ও দিয়েছেন। শিব যখন দেখেন চন্ডী ও মনসার কোন সম্ভাবনা নেই একসঙ্গে থাকার, তখন মনসাকে তিনি সিজারু পর্বতে থাকার আরামদায়ক ব্যবস্থা করে দেন। এমনকি কন্যার একাকিত্ব দূর করার জন্য নেতকেও সৃষ্টি করে দেন।এমনকি মনসার বিয়ের কথাবার্তা চলার সময় ও চন্ডীর সাথে শিব মেয়ের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করেন। এখানে আবার স্নেহশীল পিতাঁর চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে কন্যার প্রতি যে তাঁর সব সময় স্নেহ বর্ষিত হয়েছে এমনও নয়। কখনো কখনো শাসনও করেছেন পিতা হিসেবে। মনসার অন্যায়কে তিনি সমর্থনও করেন নি। চাঁদের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্বে লখিন্দরকে কেন শাস্তি ভোগ করতে হবে কিম্বা অকারণে কেন ধন্বন্তরী ওঝাকে মনসা হত্যা করবেন। এসব বিষয়কে শিব ভালো দৃষ্টিতে দেখেননি।

যাইহোক কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ শিব চরিত্রটি নির্মাণে একটা সাম্যবস্থা আনবার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেবতা আবার তাঁর মানবির সত্তা ও বর্তমান। তাঁর মধ্যে মিশেছে কঠিন কোমল স্বভাব। আবার স্ত্রীর সামনে তিনি প্রায় ভাষাহীন, স্ত্রৈন। আসলে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে দেবচরিত্রের যে মানবায়ন শুরু হয়েছিল শিব সে ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। কাজেই ক্ষেমানন্দ ও সুযোগ হাতছাড়া করেননি।

চন্ডী

পৌরাণিক চন্ডী, দূর্গা, পার্বতী, কালী, উমা, তাঁরা, ভবানী, শিবা ইত্যাদি নামে পরিচিত। প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই কৈলাসের ঘরকন্নার কথা বর্ণিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের চন্ডী শিবজায়া, মনসার বিমাতা ও বিরোধী। আপাত অর্থে চন্ডী কলহপরায়না। গ্রাম্য রমনী সুলভ তাঁর আচরণ তবে চন্ডী এও জানেন তাঁর স্বামী শিথিল চরিত্রবিশিষ্ট, পরস্ত্রীকাতর। তাই স্বামীকে তিনি সব সয় চোখে চোখে রাখেন। চন্ডীর চরিত্রের আরো কিছু দিক হল তিনি বুদ্ধিমতি, স্বাধীনচেতা, ব্যাক্তিত্বময়ী। স্বামীকে পরমগুরু বলে যেমন তিনি পুজো করেননি তেমনি আবার স্বামীর প্রতি ভালোবাসাতেও কোথাও তাঁর কার্পন্য ছিল না। তবে হ্যাঁ স্বামীকে তিনি খুব একটা বিশ্বাস ও করতেন না। নইলে মনসাকে কেন্দ্র করে শিব-শিবানীর মধ্যে এমন ঝগড়া হত না। মনসাকে চোখ

হারাতে হত না।

চন্ডী মনসাকে কোনদিন নিজের মেয়ে বলে মেনে নেননি। শুধু তাই নয়, নিজের সংসার থেকে বার করে দেবার পরও যখনি সুযোগ পেয়েছেন, তখনই মনসার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। মনসার বিয়ের সময় মনসার নিন্দে করা, বাসরঘর থেকে স্বামী জরৎকারকে পর্যন্ত কূটকৌশলে তাড়িয়ে ছেড়েছেন চন্ডী। আসলে তৎকালীন সমাজের বিমাতা চরিত্রের আদলে কবি ক্ষেমানন্দ চন্ডীকে অঙ্কন করেছেন।

মনসা সঙ্গে তাঁর এমন বৈরী ভাব যে স্বর্গে দেবতাদের সভায় বেহুলার নাচের পর মনসার নিন্দা করেছেন চন্ডী। চন্ডী এতটাই স্বার্থপর ও সংকীর্ন মনের নারী যে, সমুদ্রমন্থনের পর হলাহল পান করে শিব যখন অচেতন তখন চন্ডী সেই মনসাকেই ডেকে পাঠিয়েছেন বিষশূন্য করতে, মনসা প্রথমে আসতে রাজী না হয়েও শেষ পর্যন্ত এসে শিবের শরীর থেকে বিষমুক্ত করে দেন। তাঁরপর সামান্যতম সৌজন্য দেখিয়ে চন্ডী তাকে কোন প্রশংসাসুচক কিছু বলেন নি। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ চন্ডী ও মনসার সম্পর্ককে দোষ - গুণে মিশিয়ে এঁকেছেন। এরা দেবদেবী হলেও আসলে চারত্র্য বৈশিষ্ট্য রক্ত মাংসের মানুষ।কাজেই এদের চরিত্রে সেই মানবীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

টিপ্পনী

মনসা :

মনসা মঙ্গলকাব্যের মূল চরিত্র। এই দেবী মনসারই পূজো ও মাহাত্ম্য কীর্তনের উপাখ্যান মনসামঙ্গল। মনসামঙ্গলের সমাজকে তুলে ধরা হয়েছে - জেলে, গোপ, মুসলমান, ও বণিক। তবে প্রতিটি কাব্যেই চাঁদ বণিক ও মনসার দ্বন্দকে বেশি করে দেখানো হয়েছে। সেই সূত্রের মনসার চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা। ক্ষেমানন্দ মনসার চরিত্র চিত্রণে নতুনত্ব দেখিয়েছেন।

কেতকাদাস-প্রথমেই নতুন ভাবনাকে আনলেন কাব্যে। দেবী মনসার জন্ম পদ্মবনে না দেখিয়ে তিনি দেখান কেয়া বনে। তাই তাঁর নাম 'কেতকী'। মনসার প্রতি বঞ্চনা তাকে ক্রমশ হিংস্র ষড়যন্ত্রকারিনীকে পরিণত করে। অথচ তাঁর মধ্যেও সংসারের আকাঙ্খা ছিল। কিন্তু তাঁর জীনের স্বাভাবিক দাবি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। সেই প্রাপ্য ফিরে পেতেই তাঁর এই লড়াই। তাঁরএই হিংস্রতাঁর সঙ্গে প্রকৃত অর্থে মিশে রয়েছে ক্ষোভ, অভিমান, যন্ত্রনণা।

মনসা এ কাব্যের ট্র্যাজিক চরিত্র। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্র যেমন , নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ কাব্যেও মনসা নিয়তি লাঞ্ছিতা। তাঁর দুর্ভাগ্যের পেছনে তাঁর কোন ভূমিকা ছিল না। তিনি দেব কন্যা অথচ তাঁর স্বর্গলোকে স্থান হয় নি। আবার মর্ত্যলোকেও সহজে স্বীকৃতি পাননি।

পিতা পর্যন্ত তাকে কামনা করে। শেষ পর্যন্ত শিব অবশ্য নিজের ভুল বোঝে। তাঁরপর পিতৃগৃহে তাঁর স্নেহ-মায়া -মমতা লাভও হল না। চন্ডী নিজের সংসার থেকেও তাকে বিদায় করল। শিব তাকে সিজুঁয়া পর্বতে মনোরম পুরীতে রাখলেন। কিন্তু কন্যা

যে বড় একা। তাঁর একাকিত্ব দূর করার জন্য নেতকে সৃষ্টি করলেন। এই সিজুয়াতে থাকার সময় থেকে মনসা আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করেন।

মনসার বিবাহিত জীবনও সুখের নয়। তাঁর স্বামী জরৎকারু চন্ডীর চক্রান্তে বাসর রাতেই ঘর ছেড়ে পালান। আবার শিবের তৎপরতায় ফিরে এলেও বেশি দিন থাকেন নি। যাইহোক নরখন্ডেই মনসার যা কিছু কর্মপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেবীর শক্তি যে তাঁর সর্পবাহিনী তা তিনি বুঝে নেন। তাঁরপর সব কাহিনীতে এই বাহিনীই হয়েছে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার।

টিপ্পনী

চম্পক বা চাম্পাই নগরের অধিশ্বর হলেন চাঁদ। বণিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ শৈব। এখানেই সমস্ত বিবাদের উৎস লুকিয়ে। মনসা চান চাঁদ তাঁর পুজো করুক, কিন্তু চাঁদ তা করবে না প্রাণ গেলেও। দেবীও নাছোড়। চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করার জন্য রূপসী নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করল মনসা। চাঁদ সে ফাঁদে পা দিলেন। মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করলেন। তাতেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। চাঁদের বিশেষ বন্ধু ধন্বন্তরী ওঝাকে হত্যা করলেন অন্যায় ভাবে। নিরপরাধ ধন্বন্তরীকে হত্যা করতে মনসার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। এসব ঘটনা থেকে মনসার স্বরূপটি বোঝা যায়।

চাঁদের সুপারি বন ধ্বংস হয় পবন পুত্র হনুমানের সাহায্যে। তবে মহাজ্ঞানী চাঁদ ব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করে আবার সেই বনে নতুন সুপারি গাছ সৃষ্টি করলেন। মনসার এ কৌশল ব্যর্থ হলে নতুন কৌশল অবলম্বন করেন তিনি। চাঁদের ছয় পুত্রকে এবার বেছে নিলেন মনসা। বিষতিয়া সর্পকে এ কাজে নিয়োগ করা হল। সে চাঁদের বাড়িতে চুপি চুপি ঢুকে খাবারে বিষ উপরে দিয়ে এল। সেই খাবার খেয়ে চাঁদের ছয় পুত্র মারা গেল। মনসার ক্রোধ যত তীব্র হয়, চাঁদের মানসিক শক্তি তত বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত চাঁদের সপ্তম ও একমাত্র জীবিত পুত্রকেও মনসা কালনাগিনীকে দিয়ে দংশন করান। লখিন্দরকে দংশন করলে বেহুলা স্বামীর মৃত দেহ ফেরানোর জন্য স্বর্গে আসেন। সেখানে মনসার সামনে প্রতিশ্রুত দেন যে তাঁর শ্বশুর চাঁদবণিক মনসার পুজো করবেন। শেষ পর্যন্ত মনসাও স্বীকার করেন যে বেহুলার অপমানে তিনি লজ্জিত।

মঙ্গল কাব্যরীতি মেনে কাব্যের সমাপ্তি হয় মধুর। বেহুলা শ্বশুরকে দিয়ে পুজো দিতে বাধ্য করান। মনসা চাঁদের পুজো পেয়ে খুশী হন। চাঁদের সঙ্গে সকল বিবাদ মেটে। এখানে আবার মনসার চরিত্রের একটি দিক ফুটে ওঠে তা। মনসা স্বভাব - হিস্র নন। মর্ত্যলোকে তাঁর অপ্রতিষ্ঠিত তাকে হিংস্র করে তুলেছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে মনসা দোষে গুনে মানবোচিত হয়ে উঠেছে।

নেতা :

কেতকাদাসক্ষেমানন্দ মনসার সখী-অভিভাবকাকে 'নেত' নামে পরিচয় দিলেও অন্যান্য লেখকরা বলেছেন 'নেতা'। মনসামঙ্গলে শিবের নেত্রজল থেকে 'নেত' আর্বিভাব বলা হলেও কেতকাদাস বর্ণনা করেছেন -

"পথশ্রমে শ্রমযুত হর হৈলা শ্লথ।

টলিল ঘর্ম্মের কণা তাহে হৈল নেত।।”

নেত’র সৃষ্টির পেছনের মূল কারণ হল মনসার নিঃসঙ্গতা ঘোচানো। শুধু তাই নয় তাঁর রক্ষণাবেক্ষন, পরামর্শ বুদ্ধি দিতেও এর সৃষ্টি।

সমগ্র কাব্যে মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার পেছনে সব চেয়ে গুরুত্ব পূর্নভূমিকা নেতর। কাব্যে দেখা যায় সে বুদ্ধিমতী, স্থিতধী, দূরদর্শি। মনসা ও নেত সমবয়সী। তাই তাদের বন্ধুত্বও বেশ গভীর। মনসাকে সেই এই বুদ্ধি দেয় যে একমাত্র সর্পকুলের ভিতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এই মর্ত্যলোকে তাঁর পুজো প্রচারিত হবে। যেখানেই মনসা বিপদে পড়ে পরামর্শ চেয়েছেন, নেত ঠিক কোন না কোন অব্যর্থ পরামর্শ দিয়েছে। এমনকি বেহুলাকেও সে সাহায্য করে। স্বর্গলোকে লখিন্দরের প্রাণ ফিরে ক্ষেত্রে নেতর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সে বেহুলাকে দেবসভায় যেমন নাচতে বলে আবার তেমনি মনসাকেও দেব সভায় হাজির করে দেয়। এবং সকল সমস্যার সমাধান হয়। কাজেই চরিত্রটির মধ্যে প্রখর বাস্তব বুদ্ধি, বিবেচনাবোধ। স্নেহ-মায়া-মমতা লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা যাব নেত দেবতা না হয়েও দেবমহিমা প্রাপ্ত।

টিপ্পনী

চাঁদ সদাগর :

সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট ব্যাক্তিত্বের অধিকারী চরিত্র হল চাঁদ সদাগর। এক প্রখর অনমনীয় পৌরুষের জ্বলন্ত উদাহরণ চাঁদ চরিত্রটি। তিনি বণিক শ্রেষ্ঠ। অর্থেও সম্পদে সমৃদ্ধ। দেবতাঁর সঙ্গে তিনি সমানে সমানে লড়াই করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হেরেছেন স্নেহের কাছে।এই চাঁদ শিবভক্ত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে আছে শিবের সমুদ্রমন্থনের সময় দশম মন্থনে সমুদ্র থেকে উঠেছিলেন ‘চাঁদবান্যা’। কেতকাদাস জালু- মালুর আখ্যানেই চন্দ্রধরকে হাজির করেন। জালু -মালু মৎস্যজীবি। তাঁরা চন্দ্রধরের রাজ্যে থাকে। এক বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে ‘শতভাড়’ মাছ চাওয়া হয় তাদের দুই ভাইয়ের কাছে। তাঁরা তো একথা শুনে কাঁপতে থাকে, কেননা তাঁরা চাঁদের প্রতাপ জানে।

মনসার সঙ্গে চাঁদের বিরোধ মূলত পুজোকে কেন্দ্র করে। চাঁদ শিবভক্ত, কোন স্ত্রীলিঙ্গ দেবতাঁর পুজো তিনি করবেন না। এই দম্ভেই তাঁর পতনের কারণ হয়েছে। চাঁদের দম্ভ ছিল কৌলিন্যের , দম্ভ ছিল অর্থের, সামাজিক প্রতিষ্ঠার। এর কোনটিই মনসার ছিল না। তাই সদাগরের কাছে মনসা অপাংক্তেয় অপূজ্য। সনকা চাঁদকে বোঝানোর চেষ্টা করেন কিন্তু চাঁদ এতটাই অহংকারী যে স্ত্রীর কথা কানেই তোলেন না। তাই তিনি বলেন - ‘কি করিব চেঙ্গমুড়ি কানি’।

দম্ভের পাশাপশি ছিল চাঁদের চারিত্রিক শিথিলতা। চাঁদের বিরাট ব্যাক্তিত্বকে কলঙ্ক লেপন করেছে এই চরিত্র ভ্রষ্টা। ছদ্মবেশী নটী মনসার প্রতি তাঁর লুব্ধতা দেখা গেছে। সেই সুযোগে মনসা তাঁর মহাজ্ঞান হরণ নেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যে তা বিস্তৃত চিত্রিত হয়েছে। রূপজ আসক্তিই আসলে চাঁদের পতনের মূল কারণ হয়ে ওঠে কাব্যে।

সন্তান - বাৎসল্য তাঁর মধ্যে পুরো মাত্রায় ছিল। মনসা যখন তাঁর ছয়-পুত্র

বাণিজ্য নৌকা - সব ধ্বংস করেছে, তখন বিধ্বস্ত চাঁদ বাড়ি এসে লখিন্দরের মুখ দেখে আশার আলো দেখেন। এই লখিন্দরের বিয়ের সময় তাঁর লখিন্দরকে বাঁচানোর কি কঠিন প্রয়াস। কারণ আগেই তিনি জেনেছেন বাসরঘরে কালসাপ পুত্রকে দংশন করবে। কিন্তু বিধি বাম। শেষ রক্ষা হ'ল না, লখিন্দর মরল। শুরু হল চাঁদের অন্তর্দহন। এই জন্যই হয়তো বেহুলার অনুরোধে মনসার পুজো দিয়েছিলেন তিনি। এমন মহিময় ব্যাক্তিত্বের কি আশ্চর্য পতন।

টিপ্পনী

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের যেসুস্বাস্থ্য তা নেই চাঁদ-সনকার মধ্যে। স্ত্রীর প্রতি চাঁদের শ্রদ্ধা ছিল না। বরং তিনি খুবই অমর্যাদা করেছেন এই সম্পর্কটিকে। সনকা থাকতো চাঁদ অন্য নারীতে আসক্ত। এই প্রায় মৃত দাম্পত্যের জন্য দায়ী চাঁদই।

তবুও চাঁদ ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। তাঁর ব্যাক্তিত্বের সব চেয়ে বড় দিক হল তিনি একটি অসমযুদ্ধে প্রায় সামনে - সামনে লড়াই করার মনোভাব রেখেছেন। কোন দ্বিধা তাকে গ্রাস করতে পারেনি। চাঁদ চরিত্রের বড় ট্র্যাজেডি এখানেই যে তাঁর কোন প্রতিরোধই দৈবী চক্রান্তের কাছে টেঁকে নি। তা সত্ত্বেও চাঁদ লৌহপুরুষ, বীরত্বের প্রতিভূ। সমগ্র মধ্যযুগের গন্ডী ছাড়িয়ে আধুনিক পাঠকের দরবারে চাঁদ তাই এক ব্যাক্তিত্বের ; আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

সনকা :

চন্ডীমঙ্গলে সনকার ভুমিকা খুব গুরুত্বপূর্ন হিসেবে উঠে আসেনি কখনোই। তবে তাঁর চরিত্রের দু'টো দিক আছে। এক হ'ল তাঁর স্ত্রী সত্তা, অন্যটি তাঁর জননী সত্তা। সনকার মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের অন্তঃপুরবাসিনীদের কথা বলেছেন কবি। নারী এখানে পুরুষের ছায়াসঙ্গিনী। তাঁর নিজস্ব কোন ইচ্ছে-অভিলাশ ছিল না ল স্ত্রী ছিল স্বামীর ভোগ্য সম্পত্তি। সনকা ও চাঁদের কাছে এর চাইতে বেশি কিছু নয়। তবে চাঁদ যখন মনসার সঙ্গে বিবাদ করেন তখন আদর্শ স্ত্রীর মতোই সনকা সাবধান করেছেন স্বামীকে -

"বান্যা গেলে ছারে খারে

দেবতা সহিত বাদ কোন মূর্খে করে।।"

সনকা পতিভক্তি পরায়না। চাঁদের ছয় পুত্র মারা গেলে চাঁদ যখন বাণিজ্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন সনকা তাকে বিভিন্ন ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে এ যাত্রার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থের তাঁর অভাব নেই,তাছাড়া ছয় বিধবা পূত্রবধূকেই বা কে দেখবেন। শুধু তাই নয়, পথে বিপদ ও খুব। এ সব কিছুকেই চাঁদ গুরুত্বহীন করে দিয়ে বাণিজ্য যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। সনকার স্ত্রীর মর্যাদা ভূলুন্ঠিত হয়।

জননী সনকা প্রায় সব সমই দুঃখী। তাঁর ছয় পুত্রকে মনসা কেড়ে নিলে পুত্র শোকে সনকা পাগলিনী প্রায় -

"সনকা বান্যানী কান্দে আহি বান্ধে চুল।

ধূলায় ধুসর তনু, কান্দে শোকাকুল।।"

এরপরও তিনি স্বামীকে দোষ দেন না। কারণ মধ্যযুগের টিপিক্যাল নারীর 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনসা হাজির কাব্যে। তাঁর চিরবিষন্ন মনে প্রসন্নতা এসেছে তাঁর সপ্তম পুত্র লখিন্দর যখন জন্মাব। এই লখিন্দরের কোন অনিষ্ট যাতে মনসা না করতে পারে তাই দীর্ঘদিন পর চাঁদ বাড়িতে এলেই সনকা তাঁর পা ধরে বোঝান যে আর বিবাদে কাজ নেই। কিন্তু চাঁদ মাতৃহৃদয়ের বেদনা অনুভব করে। লখিন্দরও মারা যায় মনসার কারণে। সনকা এবার স্বামীকে আক্রমণ করেন -

"তোমার বিষম হট : ভাঙ্গিলে দেবীরে ঘট : অবিরত তাঁরে দেহ গালি।

আগে ছয় পুত্র মৈল : তবে সে লখাই হৈল : হেন পুত্র কারে দিলুঁ দালি।।"

তাঁরপর সীতাঁর মত পাতালে প্রবেশ করতে চেয়েছেন -

"সাতপুত্র - শোকে আমি: পাইলে প্রবেশি ভূমি : যদিক্ষি হএত বিদার।"

মাতৃহৃদয়ের এমন আর্তনাদ মধ্যযুঈয় বাংলা সাহিতভে কর্মই দেখা গেছে।

সনকা সংস্কারচ্ছন্ন। তাই বিয়ের দিনই লখিন্দ মারা গেলে বেহুলাকে তিনি দোষারোপ করেছেন। শুধু তাই নয় বেহুলা স্বামীকে নিয়ে গাঙ্গুড়ে ভাসতে চাইলে সনকা বাধা দিয়েছেন। সেই সনকাই আবার বেহুলা লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার পর 'খন্ড কপালিনী' পুত্রবধূকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এমনকি বেহুলার অনুরোধে চাঁদকে মনসার মাহাত্ম্য বোঝেতে চেয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে। চাঁদ মনসার পুজো দিলে দেবী মনসা বণিকের ধ্বংসপ্রাপ্ত সব ধন ফিরিয়ে দেন। ফিরেয়ে দেন ছয় পুত্রকে। সনকা আজ আনন্দে উন্মাদিনী -

"পুত্রবধূ আগে পাছে : মাঝখানে বুড়ী নাচে।"

ক্ষেমানন্দ সনকারএই আনন্দিত নৃত্যরত চিত্র দিয়ে কাব শেষ করেছেন।

বেহুলা :

মনসা মঙ্গলে চাঁদের মতোই স্থির লক্ষ্য, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন বেহুলা। তাঁর ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতা। উপস্থিত বুদ্ধি তাঁর চরিত্রের গৌরব। বেহুলা দৈতরাজ বাণের কন্যা, শাপভ্রষ্টা। শিবের শাপে অনিরুদ্ধ হলেন লখিন্দর এবং ঊষা হলেন বেহুলা। এদের কাজ হল মর্ত্যে মনসার মাহাত্ম্য প্রচার করা। সেদিক থেকে বেহুলা মনসার ব্রতদাসী। মর্ত্যে লখিন্দরের জন্মের পর নিছনি নগরে সায় বেনের ঘরে অমলার কোল আলো করে আসে বেহুলা। বেহুলা রূপে-গুণে জগৎজয়ী। বেহুলার সতিত্ব প্রবাদ প্রতীম।

এই বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে হয়। বিয়ের রাতেই বাসরঘরে কালনাগিনীর দংশনে মৃত্যু হয় লখিন্দরের। এরপর থেকে শুরু হব বেহুলার প্রকৃত জীবন সংগ্রাম। মৃত স্বামীকে নিয়ে মান্দাসে করে গাঙ্গুড়ের জলে ভাসতে ভাসতে স্বর্গের দিকে যাত্রা করেন। পথে নানা প্রতিকূলতা, বাধা অতিক্রম করে অসম সাহসিকতার

টিপ্পনী

পরিচয় দিয়ে নিজেকে লোভী পুরুষের হাত থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে, লখিন্দরের পচনশীল শরীরকে মাংসলোভী জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা করে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন দেব সভায়।

দেবসভায় দেবকুলের সামনে তিনি মনোহর নৃত্য পরিবেশন করেন। এখানে বেহুলা চূড়ান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। নৃত্য প্রদর্শনের সময় দেবতাদের আকৃষ্ট করার জন্য তিনি 'আঁচলে বয়ান ঢাকে : হাসি হাসি দশন দেখায়।" আসলে নিজের লজ্জা, ভয়, সম্ভ্রম সব বিসর্জন দিয়ে নিজেকে উজার করে দেওয়ার কারণেই তাঁর জয় হয়। শিব তাঁর নৃত্য দেখে খুশি হয়ে তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলে বেহুলা পূর্বাপর সব বর্ণনা করেন। শেষ পর্যন্ত এই শর্তে মনসা লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে চান যে, চাঁদ তাঁর পুজো দেবেন মর্ত্যে। বেহুলা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সম্মতি জানান। অবশেষে ফিরে পান স্বামীর জীবন। শুধু তাই নয় বেহুলা দেবীকে এও অনুরোধ করেছেন তাঁর ছয় ভাসুর সহ শ্বশুরের সমস্ত ডিঙা যেন ফেরত দেওয়া হয়। হৃত সর্বস্ব মনসার কাছ থেকে বেহুলা আদায় করে নিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক কিংবদন্তি চরিত্রে পরিণত হয়েছেন বেহুলা।

টিপ্পনী

লখিন্দর :

মনসামঙ্গলে লখিন্দর খুব একটা সক্রিয় চরিত্র নয়। ঘটনানকে সাহায্য করতেই যেন তাঁর আবির্ভাব। লখিন্দর শাপভ্রষ্ট। তাঁর কাজও পূর্ব নির্দিষ্ট। কেতকা দাস তাঁর কাব্যে লখিন্দরের জন্ম বর্ণনার পরই বিধাতাঁর ললাট লিখনের প্রসঙ্গ আনেন। কবি লখিন্দরের বাল্য লীলার ও বিস্তাঁরিত পরিচয় দেননি। না তাঁর যৌবনে, না বিবাহ যাত্রায়, না বাসরঘরে - কোথাও লখিন্দর সক্রিয় চরিত্র নয়।

মৃত লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পাওয়া ও বেহুলার সক্রিয়তায় ও দৃঢ় সংকল্পে। স্বর্গ থেকে ফেরার পথে বেহুলা তাঁর স্বামীকে দেবলোকে যাত্রার কথা বর্ণনা করতে থাকে। সমস্ত প্রতিকূলতাঁর কথা ও জানান। এখানে ও লখিন্দর নির্বাক মাত্র শ্রোতা। আসলে লখিন্দর বাঙালী মানসে করুণা ও সহানুভূতি পেয়ে এসেছে চিরকাল। কেননা 'মরে পুত্র জনকের পাপে'। যার নিজের কৃত কোন পাপ নেই, তা সত্ত্বেও তাঁর সংসার সুখ কেড়ে নেওয়া হয়। এটাই বাঙালীকে অনুভুতি প্রবণ করে তোলে।

৪.২.৯. সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস - ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খন্ড) - সুকুমার সেন।

৩। মধ্যযুগের বাংলা সাইত্যের তথ্য ও কালক্রম - সুখময় মুখোপাধ্যায়।

৪। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাইত্য বিষয়ক প্রস্তাব - রামগতি ন্যায়রত্ন।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য - দীনেশচন্দ্র সেন।

৬। হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয়পর্ব - হংসনারায়ন ভট্টাচার্য

৭। বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব - ড. নীহাররঞ্জন রায়।

৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১মপর্যায়) - শ্রীভূদেব চৌধুরী

৯। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল - সম্পাদক. সনৎ কুমার নস্কর।

টিপ্পনী